এক-দুই-তিন

আনন্দ

১৩৮৫

অসিতদা ও বিনীতাদিকে

সর্ব্বদা আদর দিয়ে দিয়ে যাঁরা
আমাকে একগুঁয়ে, স্পর্শকাতর
এবং লোভী করে তুলেছেন।

এই লেখকের—

কত অজানারে

[দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুরস্কৃত]

চৌরঙ্গী

নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি

যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ

পাত্রপাত্রী

রূপতাপস

মানচিত্র

পদ্মপাতায় জল

যা বলো তাই বলো

কিতনে অনজানেরে

[হিন্দী]

[হিন্দী]

(হিন্দী)

॥ এক-এ চন্দ্র ॥

ছেলেবেলায় পড়েছিলাম, এক-এ চন্দ্র। গুরুমশায় বুঝিয়েছিলেন, প্রথম জনকে হতে হবে চন্দ্রের মতো। মেঘমুক্ত গৌরবের আকাশে সাধারণের অনেক ঊর্ধ্বে সে একা জ্বলজ্বল করবে। তার কোন জুড়ি থাকবে না। সে হবে এক এবং অদ্বিতীয়।

আমার প্রথম কাহিনীও তাই নীলিমাকে দিয়েই শুরু করতে হবে। গতানুগতিকতার তারাভরা আমার স্মৃতির আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্রের মতো কেউ যদি আজও ভাস্বর হয়ে থাকে, তার নাম নিশ্চয় নীলিমা।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় নীলিমার সঙ্গে আমার কখনও পরিচয় হয়নি, এমনকি ওর একটা ছবি পর্যন্ত আমি দেখিনি। অবশ্য নীলিমার মুখটা কেমন ছিল তা আমার খুব জানতে ইচ্ছে হয়েছিল। সঙ্কোচের বাধা কাটিয়ে অবিনাশবাবুকে আমি জিজ্ঞাসাও করেছিলাম, "ওর কোনো ছবি আপনার কাছে নেই?"

"না নেই," অবিনাশবাবু বলেছিলেন। সেই সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এ-কথাও বলেছিলেন, "ছবিতে কী বুঝবেন? জলজ্যান্ত মানুষটাকে অতদিন ধরে চোখের সামনে রোজ দেখেও আমরা কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।"

অবিনাশবাবুর সঙ্গেও আমার দেখা হওয়ার কথা নয়। কোথায় তিনি পড়ে রয়েছেন, আর কোথায় থাকি আমি। কেউ কাউকে চিনি না, জানি না। কিন্তু কার্যসূত্রে সেবার আমাদের পরিচয় হয়ে গিয়েছিল।

সংবাদপত্র জগতে আমার এক শুভানুধ্যায়ী সম্পাদক বন্ধু আছেন। সময়ে অসময়ে [illegible]শবাবু বড় ছোটাছুটি করিয়ে তিনি বিশেষ আনন্দ পান। [illegible] ভাবলাম, আগের সংখ্যার কাজকর্ম শেষ করে সেবার নিশ্চিন্ত [illegible] না করাই উপভোগ করছিলাম। কিন্তু আমার কর্মসূত্র

সম্পাদক বন্ধুর তা কিছুতেই সহ্য হলো না। ট্রেনের টিকিট দিয়ে, জোর করে কলকাতা থেকে চারশ' মাইল দূরে রানীবে[illegible] রিপোর্টিং-এর কাজে পাঠালেন।

রানীবেড়াতে একটা পাহাড়ী নদীর ধারে আমাদের ক্যাম্প পড়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আরও ডজন-খানেক রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফারও ঐখানে জমা হয়েছিলেন।

ভৌগোলিক মতে রানীবেড়া একটি মালভূমি। সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাত থেকে পূর্ব ভারতের এই অরণ্যসংকুল পার্বত্য অঞ্চলটি লোকচক্ষুর অন্তরালে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেছিল। ধনলোভী শক, হূন, পাঠান, কিংবা লুণ্ঠনকারী মোগলদের কোনো পাষাণহৃদয় সেনাপতিও এই নির্জন ভূখণ্ডের নীরবতা ভঙ্গ করেনি। এমনকি ঐশ্বর্যলোভী বণিক ইংরাজও তার কলুষিত হস্তে এই যুবতী মালভূমির কুমারী অঙ্গ স্পর্শ করতে সাহসী হয়নি।

কিন্তু পরাধীনতার হাজার বছরেও যা হয়নি, স্বাধীনতার এক দশকেই তাই হলো। অনুসন্ধানী ভূতত্ত্ববিদরা নানাপ্রকারের জটিল যন্ত্রের সাহায্যে অনুসন্ধান করে ঘোষণা করলেন যে, এই আপাত কঠিন কুমারীটির বক্ষদেশ নিতান্তই কোমল ; এবং সেখানে বহু খনিজ সম্পদ সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। ভূমস্থনের এই অমৃতে ভাগ বসাবার জন্য রাজস্থানের শেঠজী, পাঞ্জাবের সর্দারজী, বোম্বাই-এর গুজরাটীভাই এবং বাংলার সায়েবসুবোরা হৈ হৈ করে এই অখ্যাত দেশে ছুটে এলেন। মাটির গভীরে এতোদিন যা ঘুমিয়ে ছিল, তাকে উপরে তুলে এনে এবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠাতে হবে। সুতরাং রেল-লাইন পাতার হুকুম হলো। রানীবেড়ার রঙ্গমঞ্চে এবার যাঁরা আবির্ভূত হলেন তাঁরা টেরিলিনের বুশশার্ট ও গ্যাবার্ডিনের প্যান্টপরা কণ্ট্রাক্টর, শাদা ড্রিলের হাফ্‌প্যান্টধারী ওভারসীয়র; এবং খাকি ড্রিলের প্যান্টপরা এ-ই-এন। তাঁদের পিছনে পিছনে এল কৌপিনধারী কুলির দল।

তাদেরই অনেকদিনের রক্তজল-করা পরিশ্রমে রানীবেড়ার অসমতল ভূমি ক্রমশঃ সমতল হলো। তারপর অরণ্যের অর্ধ-উলঙ্গ আদিবাসীরা একদিন অবাক হয়ে দেখলো টুপিওয়ালা 'খাকি-সাহেবরা' সেই সমতল ভূমির উপর ইস্পাতের রেল-লাইন বসাচ্ছে। সেই নতুন রেলপথের উদ্বোধন করতেই হাজার মাইল দূর থেকে প্রধানমন্ত্রী জেট-চারী হয়ে রানীবেড়াতে আসছেন এবং তাঁর জন্যই আমাদের আসা।

সেই ভোর থেকে দূর দূরান্তের গ্রামবাসীরা তাদের 'বড়ে রাজা'কে দেখবার জন্য, তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য নদীর ধারে জমায়ত হচ্ছিল। আদিবাসীদের রঙীন শোভাযাত্রার একটা ছোট্ট বর্ণনা, সকালেব দিকেই তারযোগে কলকাতা অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। অপবাহ্ণে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা। বক্তৃতার মধ্যে হাততালি দিয়ে অন্য লোকেরা যখন তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, আমরা তখন ওঁর বক্তব্য দ্রুতবেগে নোটবুকে লিখে যাচ্ছি। অবশেষে যখন প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ঐ পাহাড়ী নদীটার নতুন ব্রীজের উপর দিয়ে একটা জনবহুল প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলতে আরম্ভ করলো, তখন আমরা দ্রুতবেগে ক্যাম্পে ফিরে এসে টাইপরাইটারে নিজেদেব ডেসপ্যাচ তৈরী কবতে আরম্ভ করেছি।

— তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। ক্যাম্প পোস্টাপিস থেকে আমাদের খবব পাঠানোব উত্তেজনা অনেক কমে গিয়েছে। সেই সময় ডি-ই-এন মিস্টার হালদার এলেন। ওঁর পুরো নাম অবিনাশ হালদার, কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আমাদের সুখ-সুবিধের তত্ত্বাবধান করছেন।

এক গাল হেসে অবিনাশ হালদার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

বললাম, "না না। অসুবিধে আবার কী?"

অবিনাশবাবু বললেন, "আমি আরও আগে আসতে পারতাম। কিন্তু ভাবলাম, আপনারা যখন লেখালিথি করবেন তখন শুধু শুধু ডিসটার্ব না করাই ভালো।"

অ

বললাম, "মিস্টার হালদার, আপনি যে খবরের কাগজের অফিসে কোনদিন যাননি, তা আপনার কথা থেকেই বুঝতে পারলাম। দিনের পর দিন গোলমালের মধ্যে কাজ করে করে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে গোলমাল না হলে আমাদের অনেকের কলম দিয়ে লেখাই বেরোয় না।"

উনি এবার হা-হা করে হেসে ফেললেন। বললেন, "না মশাই, মাদার সরস্বতীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কটা বিশেষ মধুর নয়। তাই লেখাপড়ার কাজ যেসব জায়গায় হয়, সেখান থেকে আমি সব সময় সেফ্ ডিসট্যান্সে থাকি! দেখুন না, পেন-এ উইক বলেই তো হেড আপিস থেকে চারশ মাইল দূরে এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে পড়ে রয়েছি। লেখাপড়ার কোন বালাই নেই, শুধু কুলি ঠ্যাঙাও, মাটি ফেলো, শান্ন লাইন পেতে যাও।"

কতক্ষণেরই বা পরিচয়, কিন্তু কেন জানিনা অবিনাশবাবুর সঙ্গে আলাপটা বেশ জমে উঠেছিল। ওঁর চালচলন, কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা ঘরোয়া ভাব আছে যে বেশীক্ষণ পর হয়ে থাকা যায় না।

শ'চারেক শব্দ টেলিপ্রিণ্টারে ফাইল করেছি, আরও কিছু পাঠানো প্রয়োজন কিনা ভাবছিলাম। এমন সময় আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে অবিনাশবাবু চুপি চুপি বললেন, "সঙ্গে জীপ রয়েছে, চলুন না একটু ঘুরে আসি।"

আমার পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। এঁরা প্রোজেক্টের লোক, একলা পেলে হয়তো কোনো স্কুপ-খবরও আদায় হয়ে যেতে পারে। এবং সেই লোভেই এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। বললাম, "চমৎকার আইডিয়া, মিস্টার হালদার। ক্যাম্প পোস্টাপিসে বসে কাগজওয়ালা-দের উঁচু উঁচু নাকগুলো দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠেছি। চলুন, ক্যাম্পের বাইরে গিয়ে চোখ দুটোকে তবু একটু স্বাধীনতা দেওয়া যাবে।"

পোস্টাপিস থেকে বেরিয়ে এসে, মিস্টার হালদার নিজেই জীপ গাড়ির স্টীয়ারিং ধরলেন। ঠিক ওঁর পাশে বসে, আমিও ... ডি

ওঁকে ভালভাবে দেখে নিলাম। মোটাসোটা ভদ্রলোকটি, টিপিক্যাল গোবেচারী বাঙালী চেহারা। বয়স হয়েছে, এবং রিটায়ার করতে যে বেশী দেরী নেই তা মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে মিস্টার হালদার বললেন, "রানীবেড়াতেই যখন এলেন, তখন গরীবের বাড়িতে একবার পদধূলি দেবেন চলুন। কলির রামচন্দ্র আমরা, বিনা অপরাধে কেমন বনবাস যন্ত্রণা ভোগ করছি তা নিজের চোখে দেখে আসবেন।"

"আবার কেন আপনাকে কষ্ট দেওয়া," আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু উনি শুনলেন না। বললেন, "এ-বয়সে আমাদের কপালে দুঃখ-কষ্ট ছাড়া আর কী থাকতে পারে স্যার?" তারপর একটু থেমে বললেন, "এখান থেকে বেশী দূর নয়। মাত্র মাইল পনেরো; আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। পাকা রাস্তা আছে, হুস করে পৌঁছে যাবো।"

এবড়োখেবড়ো পাথুরে পথ পেরিয়ে, ডানদিকে মোড় ফিরে জীপটা এবারে একটা বড়ো রাস্তায় এসে পড়ল। রাস্তাটা সত্যি সুন্দর। বিরাট ক্যানভাসের উপর আর্টস্কুলের সোনার মেডেল-পাওয়া কোনো ছাত্র যেন পথের ছবি এঁকে দিয়েছে—কোথাও কোনো খুঁত নেই। চওড়া, সোজা রাস্তা, গাড়িরও তেমন ভিড় নেই। আমাদের জীপটাও যে খুব পুরনো নয়, তা মোটর কোম্পানীর লেবেল থেকেই বুঝতে পারলাম। কিন্তু মিস্টার হালদারের হাতে স্পীডোমিটারের কাঁটা মাত্র দশ থেকে পনেরোর মধ্যে নাচানাচি করছে।

হুসহুস করে গোটা দশেক মোটর আর স্টেশন ওয়াগন আমাদের পিছনে ফেলে রেখে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আমি নিজে কিছুই বলিনি। কিন্তু হালদার সায়েব আমার মুখের ভাব দেখেই যেন মনের কথাটা বুঝতে পারলেন।

তাই নিজে থেকেই বললেন, "যে যাচ্ছে তাকে যেতে দিন। বেপরোয়া গাড়ি চালানোর মধ্যে আমি নেই।"

দূরে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ঐ দিকে আঙুল দেখিয়ে উনি বললেন, "ঐ পাহাড়ের ঠিক ওধারেই আমার বাড়ি—সেকসন ফোর এরিয়া। দশটা সেকসনের চার্জ ছিল আমার ওপর। দু'জন মাত্র এসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার নিয়ে এই চল্লিশ মাইল লম্বা রেল লাইন পেতেছি আমরা। দু'বছরে দশ কোটি কিউবিক ফুট শুধু মাটিই কাটা হয়েছে।"

কিউবিক ফুটে আমার আগ্রহ নেই, আমার মন তখন অন্য জায়গায় পড়ে রয়েছে। বললাম, "মিঃ হালদার, টেলিপ্রিণ্টারে সারাদিন তো শুধু শুকনো বক্তৃতা পাঠালাম; কোন হিউম্যান স্টোরি থাকলে বলুন।"

আমাদের খবরের-কাগজী ভাষা ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন না। বললেন, "স্টোরি তো আপনিই লেখেন শুনলাম। আমার মশাই ওসব একদম আসে না।"

বললাম, "না না, ছোটো গল্প নয়, হিউম্যান স্টোরি। যেমন মাটি খুঁড়তে গিয়ে হয়তো অনেক সাপ বেরিয়েছে। হয়তো বাঘেরা ক্যাম্প আক্রমণ করেছে। কিংবা হাতীরা হয়তো দলবেঁধে লাইন তৈরির কাজে বাধা দিয়েছে।"

"তার মানে এনিম্যালদের স্টোরি বলুন।"

"আজ্ঞে, এই সব ঘটনাকেই খবরের কাগজে হিউম্যান স্টোরি বলে।"

মিঃ হালদার মাথা নাড়লেন। বললেন, "না, আমি দুঃখিত। কাজ করতে গিয়ে কাউকে এখানে সাপে কামড়ায়নি, বা বাঘে ধরে নিয়ে যায়নি। কেউ এখানে মরে নি। কেবল একজন···" স্টিয়ারিংটা ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোক কি যেন ভাবলেন, পরমুহূর্তে বললেন, "না থাক্, তার সঙ্গে এই রেললাইনের কোনো সম্পর্ক নেই।"

"বাইরের কেউ এখানে প্রাণ হারিয়েছে নাকি?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

কিন্তু মিঃ হালদার আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন।

নতুন তৈরি রেললাইনটা বাঁদিকে রেখে আমাদের জীপ এগিয়ে চলল। রেললাইনটার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে মিঃ হালদার বললেন, "ছোকরার কাজকর্ম খুব ভাল ছিল। সময়-মতো ও বড়ো হতে পারতো।"

কথার ফাঁকে ফাঁকে কোন সময় আমরা মিঃ হালদারের কোয়ার্টারে পৌঁছে গিয়েছি।

কোয়াটার মানে একটু বড় আকারের তাঁবু। তাঁবুর পর্দাটা নিজে হাতে তুলে ধরে মিস্টার হালদার বিনীতভাবে বললেন, "আসুন, আসুন, এই আমার বাকিংহাম প্যালেস।"

প্রচুর খাতির করে মিঃ হালদার আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনার একটু কষ্ট হবে। এখানকার সব কিছু অগোছাল। বেদেদের মতো আমাদের জীবনের সবটাই তো তাঁবুতে কেটে গেল, সভ্য হওয়ার সুযোগই পেলাম না।"

নিজের জামা-কাপড়ের দিকে তাকিয়ে উনি হঠাৎ আঁতকে উঠলেন। বললেন, "জঙ্গলে থেকে থেকে একেবারে জানোয়ার বনে গিয়েছি। আমার জামাকাপড় যে এত ময়লা হয়েছে খেয়ালই ছিল না।"

অতি অমায়িক মানুষ মিস্টার হালদার। নিজের হাতে ট্রে সাজিয়ে কাপ ডিস নিয়ে এলেন। কফি তৈরি করলেন। তারপর বললেন, "আঠারো বছর বয়সে কাজে ঢুকেছি—কত জায়গায় তো লাইন, আর ব্রীজ তৈরী করে এলাম, কিন্তু রানীবেড়ায় এই কাজটা আমার চিরকাল মনে থাকবে।"

একটু থামলেন মিঃ হালদার। তারপর বললেন, "আপনিতো

মশাই সাহিত্যিক লোক। সাধারণ মানুষ আপনাদের কথাটথা তবু শোনে। আপনার লেখার মধ্য দিয়ে একটা কথা তাদের বলবেন—"

"কী কথা?" আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম।

"তারা যেন গাড়িটাড়িগুলো একটু সাবধানে চালায়। পৃথিবীতে সব কিছু সাবধানে করা দরকার। একজনের ছোটো ভুলের জন্য এই সংসারে অনেককে বহু বড়ো মূল্য দিতে হয়।"

বললাম, "আমাকে বেশ বিপদে ফেললেন, মিঃ হালদার। আমাদের লেখা যাঁরা ভালবাসেন এবং পড়ে আনন্দ পান, তাঁরা সাধারণ মানুষ; তাঁদের ক'জনেরই বা গাড়ি আছে বলুন? তাছাড়া সাবধানে ড্রাইভ করে দুর্ঘটনা এড়ানোব আবেদন ট্রাফিক পুলিশ আর অটোমোবাইল এসোসিয়েশন তো বহুদিন থেকেই প্রচার করে আসছেন।"

আমার বক্তব্য মিস্টার হালদারের মনে কোনো রেখাপাত করলো না তা সহজেই বুঝতে পারলাম। চামচ দিয়ে গরম কফি নাড়তে নাড়তে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনি বয়সে আমার থেকে অনেক ছোট। কিন্তু আপনারা পণ্ডিত লোক, অনেক বই-টই পড়েছেন, অনেক চিন্তা করেছেন। অনেকদিন ধরে বহু চেষ্টা করেও একটা প্রশ্নের উত্তর আমি আজও পাইনি। হয়তো কোনো দর্শনের বইতে এর উত্তর লেখা আছে, আমি জানি না। আপনারা মানুষের মন নিয়ে নাড়াচাড়া করেন; হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। আচ্ছা, বলতে পারেন, মেয়েদের যতোগুলো গুণ বা ভার্চু আছে তার মধ্যে সতীত্বের স্থান কত নম্বরে?"

বেশ ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম। বললাম, "মিঃ হালদার, পাশ্চাত্ত্যের চিন্তানায়করা সাহসকে পুরুষের শ্রেষ্ঠ গুণ বলে স্থির করেছেন। কিন্তু মেয়েদের ভার্চু সম্বন্ধে সেরকম কিছু তো পড়িনি।"

মিঃ হালদার বললেন, "আপনার বা আমার স্ত্রীকে এ-প্রশ্ন করে লাভ নেই—আমাদের এই আলোচনা কানে গেলে তাঁরা তো ঝাঁটা

হাতে তেড়ে আসবেন। কিন্তু এই জঙ্গলে বসে চোখের সামনে যা দেখলাম, তাতে আমার মতো গোঁড়া ধর্মভীরু লোককেও বেশ চিন্তায় পড়তে হয়েছে।"

মিঃ হালদার একটা চুরুট ধরালেন। আমাকে বললেন,"ঐভাবে চেয়ারে জড়োসড়ো হয়ে না থেকে, জুতোটা খুলে আমার ক্যাম্প-খাটটায় পা তুলে বসুন।" তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার তো আর ক্যাম্পে ফিরবার তাড়াতাড়ি নেই। বিদেশের এই নিঃসঙ্গ বাঙালী বৃদ্ধকে না হয় একটু সঙ্গ দিলেন।"

বললাম, "কোনো আপত্তি নেই। আসলে রাত্রের অন্ধকারে হ্যারিকেনের আলো জ্বালিয়ে ক্যাম্পে বসে আপনার সঙ্গে গল্প করতে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করছি।"

উনি চুরুটটাতে একটা লম্বা টান দিয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "আপনার কাছে সমস্ত অপরাধটা অকপটে স্বীকার করলে তবু একটু শান্তি পাবো। হাতে যখন কোনো কাজ থাকেনা, হ্যারিকেনের আলোটা কমিয়ে দিয়ে, একলা চুপচাপ ক্যাম্প-চেয়ারে বসে থাকি, তখন হারিয়ে-যাওয়া ঘটনাগুলো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। আমার ভয় হয়। আমি বেশ বুঝতে পারি ব্যাপারটায় আমার দায়িত্বও কম ছিল না।

সত্যিকথা বলতে কি, এই পাণ্ডববর্জিত দেশে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে আসবার বিশেষ ইচ্ছে ছেলেটার ছিল না। কেন জানিনা আমার মনের মধ্যে দুষ্টুমি বুদ্ধিটা হঠাৎ জেগে উঠলো ; তখন আমিই ওকে তাতালাম।" অবিনাশবাবু একটু থামলেন।

"ছেলেটি কে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"ওহো, তাই তো আপনাকে বলা হয়নি," অবিনাশ হালদার পিঠটা সোজা করলেন।

বললেন, "ওর নাম কোহিনূর মিত্র। এই লাইনে মাটি ফেলার কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ঠিক তখনই ছেলেটি এখানে

বদলি হয়ে এল। এসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার। বছর পঁচিশেক বয়স। শিবপুর থেকে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে, রেলের আই-আর এস-ই পরীক্ষা দিয়েছিল। যাকে বলে কিনা বর্ণ-অফিসার—কবচ-কুণ্ডল নিয়ে জন্মেছে, আমাদের মতো প্রমোটেড্ মাল নয়। আমরা তো সেই ওভারসীয়ার হয়ে ঢুকেছিলাম, তারপর প্রমোশনের তেলমাখানো বাঁশ বেয়ে এক গাঁট এক গাঁট করে উঠতে উঠতে মরণকালে যেখানে মাচা বেঁধেছি, ওদের সেইখান থেকেই শুরু। কিন্তু কেন মিথ্যে বলবো, ভারি ভালো ছেলে। আমাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতো। কাজে ভুল করলে কতবার রাগের মাথায় বকুনিও দিয়েছি, কিন্তু ছোকরা কোনোদিন মুখ ফুটে প্রতিবাদ করেনি।

কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্টের ডি-ই-এন আমি অবিনাশ হালদার সেই থেকেই মজে গেলাম। জীপে করে প্রায়ই পাহাড়ের এদিকে কোহিনূর মিত্রের তাঁবুতে এসে বসতাম। বলতাম, মিস্টার মিত্র, মাঠে ঘাটে কাজের সুযোগটা আপনাদের পক্ষে খুবই মূল্যবান। কমবয়সে ঢুকেছেন, দুদিন পরেই আমার পোস্টে বসবেন—তারপর ডেপুটি, তারপর চীফ, তারপর জি-এম। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্ররা একটু মুখ তুলে চাইলে, বোর্ডের মেম্বার হয়েই যে রিটায়ার করবেন না এ-কথা কে বলতে পারে?" অবিনাশ হালদার একটু থামলেন।

"তারপর?" আমি প্রশ্ন করলাম:

অবিনাশ হালদার আবার আরম্ভ করলেন—

"তারপর একদিন খবর পেলাম কোহিনূর মিত্র বিবাহিত। ছোকরাকে চেপে ধরলাম—'হ্যাঁ মশায়, আপনি যে রিসেণ্টলি ম্যারেড, তা তো কখনও বলেননি?'

কোহিনূর সলজ্জ হেসে বলেছে, 'তা আর বলবো কী?'

'তা সত্যি। আপনার ক্যাম্পখাটের পাশে টিপয়ে রাখা ফটোটা দেখে আমারই বোঝা উচিত ছিল!' আমি হা-হা করে হেসে ফেলেছি। বলেছি, 'তবে মশাই আপনাদের এই বিচ্ছেদটা আমাদের

পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। কারণ বাল্মিকীর সেই ব্যাধের মতো আমরাও নিশ্চয় বিরহিনী সতীসাধ্বীর অভিশাপ কুড়োচ্ছি! দিন দশেকের ছুটি দিয়ে যে আপনাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবো, তারও উপায় নেই। লাইন পাতার কাজ কয়েকদিনের মধ্যে শেষ করতে হবে—সামনেই, জি-এম এর ইন্সপেকশন।'

তীব্র প্রতিবাদ করতে গিয়ে কোহিনূর মিত্র কানের পাতা দুটো লাল করে বসলো। জোর গলায় বললে, 'না না, কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু শুধু ছুটি নিয়ে কী করবো?'

আমি মশাই সহজ সরল মানুষ, মনের মধ্যে জিলিপির প্যাঁচ নেই। ওর কথা শুনে বেজায় চটে উঠলাম। বললাম, প্রয়োজন নেই, বললেই হলো? আমাদেরও মশাই একদিন আপনাদের বয়স গিয়েছে। সে সব দিনের কথা এখনও ভুলিনি। আমি তখন রাজগীরে সার্ভে করছি। মাস কয়েক হলো বিয়ে হয়েছে। শ্রীমতী পড়ে রয়েছেন কলকাতায়। সেখান থেকে অভিমান করে তিনি তো একখানা চিঠি ছাড়লেন। আর নতুন বিয়ে-হওয়া মেয়েদের অভিমান যে কি ডেঞ্জারাস তা তো আপনি এখনও জানেন না। চিঠিখানা পেয়ে মেজাজটা এমন খারাপ হয়ে গেল যে, ছুটি না নিয়েই পালিয়ে এলাম। আপিস থেকে টেলিগ্রাম পাঠাল মেডিক্যাল অফিসারের সামনে এপিয়ার হও। আমার অবস্থাটা তখন বুঝুন। বৌকে খুশী করতে গিয়ে চাকরিটা যায় আর কি! কিন্তু মশাই, তখন দিনকাল আলাদা ছিল। সি-এম-ও বুকে পিঠে ষ্টেথো লাগিয়ে বললে, 'বাবু, তোমার যা ফিটনেশ তাতে তোমাকে এভারেস্ট এক্সপিডিশনে পাঠানো যেতে পারে। তা রাজগীর থেকে পালিয়ে এলে কেন? লজ্জার মাথা খেয়ে তখন আসল ব্যাপারটা বললাম। শুনে সায়েব পিঠে চাপড় মেরে বললে, 'আই সি। মোস্টসার্টেনলি, নিশ্চয় ছুটি পাবে। আমি যতোক্ষণ আছি কোনো চিন্তা নেই, কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' খস খস করে লিখে দিলে—

নার্ভাস রোগ। এক মাসের পুরো বিশ্রাম!"—অবিনাশবাবু এবার একটু থামলেন।

আমি বললাম, "আপনাদের সি-এম-ও তো বেশ রসিক সায়েব ছিলেন।"

অবিনাশবাবু বললেন, "এখন বলতে লজ্জা নেই, রাজগীর থাকতে আমি এইভাবে তিনবার পালিয়েছিলাম।"

একটু থেমে অবিনাশবাবু আবার বললেন, "তবে তখন কাজে আমাদের এত দায়িত্ব ছিল না। এখন এই এক ফোঁটা বয়সেই বিরাট দায়িত্ব,—পাঁচটা সেকশনের রেসপন্সিবিলিটি।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

হালদার সায়েব বললেন, "সেদিনকার মতো প্রসঙ্গটা বন্ধ হলেও সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। তারপর একদিন জীপ থেকে নেমে প্রায় লাফাতে লাফাতে এসে কোহিনূরকে বললাম, 'বুদ্ধি বেরিয়ে গিয়েছে। আমাদের বৌমাকে এখানে নিয়ে আসুন।'

'কোথায়? এই তাঁবুতে? যার আট মাইলের মধ্যে কোনো জনবসতি নেই?' কোহিনূর যেন একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করেছিল।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। বিয়ের এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি এখানে চলে এসেছেন। ভাবুন এইখানেই আপনাদের হনিমুন। আমি তো যতোদূর জানি, হনিমুনের জন্যে সায়েবরা এই রকম নির্জন জায়গাই পছন্দ করে।' কথা না বাড়িয়ে আমি কোহিনূরের তাঁবুটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। শেষে বললাম, 'এই তাঁবুতে হবে না। আমার তাঁবুটা অনেক বড়ো, কালই ওটা পাঠিয়ে দিয়ে এইটা নিয়ে যাবো।'

'সে কি! তা হয় না। মিসেস হালদার যদি কখনও আসেন?' কোহিনূর বলেছিল।

আমি বলেছিলাম, 'সে গুড়ে বালি! তিনি এখন বড়োমেয়ের সাধ, মেজছেলের পরীক্ষা, ছোটছেলের আমাশা ইত্যাদি নিয়ে বেজায় ব্যস্ত আছেন। এখানে আসবার একটুও ইচ্ছে নেই তাঁর।'

মুখে আপত্তি জানালেও প্রস্তাবটা কোহিনূরের বেশ ভাল লেগেছিল। তার উপর আমি নিজেই হৈ চৈ করে, কোহিনূরের লজ্জা বাঁচিয়ে ওর বাবাকে চিঠি লিখে দিলাম।

বৌমা সত্যই একদিন আসছেন শোনা গেল। নাম নীলিমা। ট্রেন থেকে তাকে নামতে দেখেই চোখ দুটো যেন জুড়িয়ে গেল। চোখের সামনে সেদিনের দৃশ্যটা আজও যেন দেখতে পাচ্ছি। কলকাতার এক্সপ্রেস গাড়িখানা স্টেশনে এসে থামতেই ফার্স্ট ক্লাস কামরার দরজাটা খুলে গেল। আর সেইখানে দেখা গেল হালকা খয়েরি রঙের ছাপানো বাঙালোর সিল্কের শাড়ী-পরা কুড়ি-একুশ বছরের এক তন্বী যুবতীকে। পায়ে সবুজ রঙের হাওয়াই স্যাণ্ডেলের মধ্য দিয়ে আলতায় লাল নখগুলোর দিকেও আমার নজর পড়েছিল। হাত দুটো সরু সরু হলেও, ঠিক যেন ওর চটুল দেহের অন্য অংশের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে তৈরি করা। আর মুখটি দেখলেই বোঝা যায়, অভিজাত গৃহের নিষ্পাপ সরল মেয়ে। এদের যেন জাতই আলাদা, আমার মনে হয়েছিল।

কুলিরা এসে কামরা থেকে হোল্ড-অল, সুটকেশ আর ব্ল্যাক জাপান রঙের ট্রাঙ্কটা নামিয়ে রাখলো। কোহিনূর পরিচয় করিয়ে দিতেই সে আমাকে আলগোছা অথচ মিষ্টি একটি নমস্কার জানাল।

জীপে ওদের দুজনকে তুলে দিয়ে, আমি নিজের ক্যাম্পে যাবার জন্য অন্য এক গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কোহিনূর বাধা দিলে, বললে, 'তা হয় না, কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ আমার বাড়ি থেকে ঘুরে যেতে হবে।'

'ও বাবা, বৌমা মাটিতে পা দিতে না দিতেই তোমার তাঁবুটা বুঝি বাড়ি হয়ে গেল। বাঃ, চমৎকার।' আমি হা-হা করে হেসে ফেললাম।

ক্যাম্পে যাবার পথে একটু প্রাণ খুলে গল্প করার সুবিধের জন্য জীপ ড্রাইভারকে আমরা চলে যেতে বললাম। কোহিনূর বললে, 'আপনি বসুন, আমিই চালাচ্ছি।'

আমি রাজী হলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কি ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে?'

'লাইসেন্স না থাকলেও, অনেক পাকা ড্রাইভারকে আমি গাড়ি চালানো শেখাতে পারি। একটা এপ্লিকেশন করে দিলেই হয়, শুধু কুড়েমি করেই লাইসেন্সটা নেওয়া হচ্ছে না।'

কেন জানিনে আমার মনে হলো, কোহিনূর যেন নববধূকে শুনিয়ে শুনিয়েই কথাগুলো বললে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললাম, 'বৌমার, একা একা ট্রেনে আসতে কোনো…'

"না, বিয়ের আগে তো টোঁ টোঁ করে একলা সমস্ত কলকাতা শহর চষে বেড়াতো", কোহিনূরই উত্তর দিলে।

'একদম বাজে কথা, কে বলেছে?' নীলিমা এমনভাবে প্রতিবাদ করলো যেন ওদের কতদিনের পরিচয়।

ওদের কথাবার্তা শুনে আমি হঠাৎ একটু দার্শনিক হয়ে পড়লাম। মনে মনে ভেবে অবাক হলাম যে, মাত্র দু'মাস আগেও এরা কেউ কাউকে চিনতো না। আর এই দু'মাসের মধ্যেও মাত্র সাতদিন ওরা পরস্পরের সান্নিধ্য পেয়েছে!

আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠের মধ্য দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে কোহিনূরের স্ত্রীকে বললাম, 'কোহিনূরের মুখে শুনেছি তোমার পদ্যটদ্য লেখার অভ্যাস আছে। তা হলে তো এই পাহাড়, এই ঝর্ণা, এই খোলা-মেলা মাঠ তোমার কাজে লেগে যাবে। রবিঠাকুর তো এই সব জায়গা নিয়ে বই লিখতে ভালোবাসতেন।'

'এ-সব দু'এক দিনই ভালো লাগে। তারপর এই জনহীন মরুভূমিতে কলকাতার মডার্ন গার্লদের প্রাণ আইঢাই করে উঠবে।' কোহিনূর একটু যেন কৌতুক করেই বললো।

তাতে আমি রেগে উঠলাম। বললাম, 'আমরা নদী, পাথর, মাটি, ব্রীজ, পয়েন্টস্ এবং ক্রসিং সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। কিন্তু

মেয়েদের মন সম্বন্ধে কিছুই জানি না।' ছাঁচটা আলাদা আলাদা হলেও, পৃথিবীর সব মেয়েদের মন ভগবান একই মেটিরিয়ল দিয়ে তৈরি করেছেন। সেই জন্য আসল জায়গায় গাঁয়ের মেয়ে, শহরের মেয়ে, কলেজে-পড়া মেয়ে, সই-করতে-না-পারা মেয়ে সবই এক। সীতা যদি স্বামীর জন্য অযোধ্যা ছেড়ে বনে গিয়ে থাকতে পারেন, তাহলে কলকাতার যে কোনো মেয়েই স্বামীর জন্য এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পে এসে থাকতে পারবে।'

ওদের দু'জনের কেউই কোনো কথা বললো না। যেন দুটো প্রায় অপরিচিত ছেলে মেয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, এই জন্যই সংসারে দেওর, জা, ননদ, শাশুড়ী থাকা দরকার। হৈ-হৈ হট্টগোল করে আড়ষ্ট সম্পর্কটা তারাই অনেক সহজ করে দেয়।

অবশেষে আমরা ক্যাম্পে এসে পৌঁছলাম। ওদের দু'জনকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে, চাকরকে চা তৈরী করতে বলে, আমি আর একবার নিজের জীপের কাছে গেলাম। মাইল দশেক দূর থেকে কিছু দেশী মিষ্টি আনিয়ে রেখেছিলাম। মিষ্টির প্যাকেটটা ওদের সামনে এনে খুলে দিলাম। অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে থেকে নীলিমা এবার মুখ তুললো।

আমি বললাম, 'কই ? খাচ্ছ না তো। এতো তোমারই সংসার। তুমিই তো আমাদের বলবে এটা খান, ওটা খান, না হলে মাথা খান।' রসিকতাটা করেই কিন্তু একটু সঙ্কোচ হলো। কলকাতার শিক্ষিত মেয়েরা এই ধরনের রসিকতা বরদাস্ত করে কিনা কে জানে।

নীলিমা অবশ্য কিছুই বলেনি। চুপচাপ খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আমি তখন নীলিমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করেছি। ওর বাবা জেলা জজ ছিলেন শুনে, কোন্ কোন্ জেলায় ওরা বেড়াতে গিয়েছে জিজ্ঞাসা করেছি। 'এইটুকু মেয়ে ইতিহাসে এম-এ পাশ করেছে শুনে আমি তো অবাক হয়ে গিয়েছি। দেখলে তো কিছুই বুঝতে পারা যায় না।

কোহিনূর মিত্রও যেন এই একঘণ্টার মধ্যেই কেমন পালটিয়ে গিয়েছে। লজ্জার রাঙা পরশ যেন ওর ওপরেও এসে পড়েছে।

ওদের দু'জনকে ঐ অবস্থায় রেখে আমি আবার নিজের ক্যাম্পে ফিরে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। নির্জন এবড়ো-খেবড়ো প্রান্তরের মধ্য দিয়ে জীপ চালাতে চালাতে অনেক অদ্ভুত চিন্তা মাথার মধ্যে এসেছে। ভেবেছি, আমরা সারাদিনই তো কাজ নিয়ে পড়ে থাকবো। ঝড়, জল, যাই হোক না কেন এই কুড়ি মাইল এলাকার কাজ কোহিনূরকে দেখতেই হবে। কাজের নেশায় সারাদিনটাই ক্যাম্পের বাইরে যে কী ভাবে কেটে যাবে, তার খেয়াল থাকবে না। তখন ওই কাজল-পরা টানা টানা চোখের নিঃসঙ্গ মোমের পুতুলটা কী করবে ?

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পাকা রাস্তার উপর গাড়িটা আনতে আনতে হঠাৎ মনে হলো, আমি বড়ো বেশী ভাবছি। ভাবতে হলে তো আরও হাজার হাজার লোকের কথা আমার ভাবা উচিৎ ছিল—যে সব মেয়েরা সারাদিন মাটি কেটে রাত্রে গাছের তলায় ঘুমিয়ে থাকে ; বৃষ্টি হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজা ছাড়া যাদের কোনো গত্যন্তর থাকে না।

পরের দিন ভোরে জীপ গাড়িটা চালিয়ে আমি এই দিকেই কাজে আসছিলাম। এই শিশির-ধোয়া ভোরবেলাটা আমার মতো অরসিকেরও অদ্ভুত ভালো লাগে। ক্যাম্পের বাইরে পাহাড় থেকে আরম্ভ করে ঘাসগুলো পর্যন্ত সবই যেন ভিজে ভিজে। সকাল বেলায় পাহাড়টার দিকে তাকালে মনে হয় যেন ওর বয়সটাও অনেক কমে গিয়েছে। বনের মধ্যেও এবার লাল লাল এক ধরণের ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে।

কোহিনূর মিত্রের ক্যাম্পে এসে দেখলাম ওরা নেই।

বেয়ারা বললে, সায়েব মেমসায়েব দু'জনেই নাকি ভালো করে ভোর হবার আগেই বেরিয়ে গিয়েছেন। আমার এবার মনে হলো

তাইতো গাড়িতে আসবার পথে মাঠের মধ্যে কাদের যেন একটা পাথরের ঢিবির ওপর বসে থাকতে দেখলাম। কিন্তু আমি ওদিকে নজরই দিইনি। যারা কাল সন্ধ্যাবেলাতেও লজ্জায় কেউ কারও সঙ্গে কথা বলতে পারছিল না, তারাই যে আজ এই ভোরে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে যেতে পারে তা আমার কল্পনাতেই আসেনি।

হাতের কাগজপত্রগুলো টেবিলের উপর রেখে, ক্যাম্পের মধ্যে আমি চুপচাপ বসে রইলাম। কিছু আলোচনা করবারও আছে। তিন নম্বর সেক্সনে রেলপাতার কাজ একটু পিছিয়ে রয়েছে—ঠিকাদারদের টাইট দেওয়া দরকার। জি-এম-এর ইন্‌স্‌পেকসনের আগে লিংকিং শেষ করতেই হবে।

কতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম মনে নেই। হঠাৎ মনে হলো, এমন সময় আমার আসা উচিৎ হয়নি। এই ভোরবেলায় নব-বিবাহিত দম্পতির প্রাইভেসীকে ডিসটার্ব করবাব কোনো অধিকারই আমার নেই।

ক্যাম্প থেকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু রাস্তার মোড় ফিরতেই দূর থেকে ওদের দু'জনকে দেখতে পেলাম। কিন্তু কোহিনূরকে যেন খুবই উত্তেজিত মনে হচ্ছে। হ্যাঁ তাইতো, আরও কে একজন যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাফপ্যান্টপরা একটা লোক মনে হচ্ছে।

আরও একটু এগিয়ে এসে মনে হলো ব্যাপারটা একেবারে স্বাভাবিক নয়। নীলিমা যেন কেমন একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে। কোহিনূরকে বলছে, 'চলো, ফিরে যাই।'

কিন্তু সে কথায় কান না দিয়ে কোহিনূর চিৎকার করে লোকটাকে বলছে, 'কোথায় থাকো তুমি? আজই তোমাকে এই এরিয়া থেকে পুলিশ দিয়ে দূর করে দেবো।'

লোকটা বলছে, 'সা'ব, এবারের মতো আমার মাপ করুন। ভুল হয়ে গিয়েছে। হুজুর, আপনারা মা-বাপ, আপনারা না দেখলে…।'

লোকটা এবার কোহিনূরের পা জড়িয়ে ধরতে গেল। তাই দেখে কোহিনূর মিত্র রবারের গামবুট-পরা ডান পাটা এমন জোরে ঝাঁড়লো যে, লোকটা ভয়ে পেছিয়ে গেল, এবং সেই সুযোগে নীলিমার হাতটা টেনে ধরে কোহিনূর হন হন করে এগিয়ে এল। লোকটা হয়তো ছুটে এসে আবার ওর পা জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করতো। কিন্তু আমি তখন কাছে এসে পড়েছি এবং সশরীরে ডি-ই-এন সায়েবকে চোখের সামনে দেখেই লোকটা আরও ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

আমাকে সামনে দেখে কোহিনূর মিত্র আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। যেন কিছু হয় নি। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ছোটোছেলের মতো চিৎকার করে বললে, 'আরে, কখন এলেন ? চলুন, চলুন।'

কোনো উত্তর না দিয়ে গম্ভীরভাবে ওদের সঙ্গে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। নীলিমা তাড়াতাড়ি কফি নিয়ে এল। ক্যাম্পের ভিতর চেয়ারে বসে কফি খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ব্যাপার ?'

'আর বলবেন না। সেই ড্রাইভারটা। হরিয়া না কি নাম।' কোহিনূর উত্তর দিল।

'কী নাম বললে ?' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

কোহিনূর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললে, 'স্কাউণ্ড্রেলটা বহুদিন থেকেই চাকরির জন্য ঘোরাঘুরি করছে। অতি বদ লোক। ওর লাইসেন্স আমি দেখেছি—বেপরোয়া গাড়ি চালানোর জন্য তিন মাস লাইসেন্স সাসপেণ্ডেড ছিল। তাও হয়তো ওর কেসটা বিবেচনা কবা যেতো, হাজার হোক বেটা এই এলাকার পথঘাট সব চেনে। কিন্তু ইডিয়টটার সাহস এতো বেড়ে গিয়েছে যে, আমাদের প্রাইভেসীকে পর্যন্ত রেসপেক্ট করে না। আমরা যেখানে গিয়ে সকালে বসেছি, সোজা সেইখানে গিয়ে বলে কিনা, আমার চাকরির কী হলো ?'—ইংরিজী এবং বাংলার জগাখিচুড়ি করে কোহিনূর মিত্র অনেকগুলো গরম গরম কথা একসঙ্গে বলে গেল।

আমি বললাম, 'লোকটাকে আমি দেখেছি বটে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গাল দুটো চুপসে গিয়ে চোয়ালটা বেরিয়ে পড়েছে। সর্বদা ময়লা খাকি শার্ট আর প্যান্ট পরে থাকে। কাজের জন্য আমার কাছেও কয়েকবার গিয়েছিল। লোকটার কী জাত বলো তো?'

'ব্যাটা অদ্ভুত টাইপের বাংলা বলে। আমার ড্রাইভারের কাছে শুনেছি যে···' হঠাৎ নীলিমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে কোহিনূর থমকে গেল। বললে, 'সে আপনাকে পরে বলবো।'

নীলিমাও কিন্তু এতোক্ষণ গম্ভীর মুখে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার সে বললে, 'আমার সামনে বলতে অসুবিধা থাকলে, আমি বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।'

আমি বাধা দিলাম। 'না না, কোনো দরকার নেই।'

মুখটা কুঁচকে কোহিনূর বললে, 'এমন কিছু গোপনীয় কথা নয়। শুনেছি, কোন্ আয়ার ছেলে, হাফ বাঙালী, হাফ নেপালী বা ঐ জাতীয় কিছু।'

আমি এতোক্ষণ নীলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মুখের ভাব লক্ষ্য করছিলাম। কোহিনূরের কুলি তাড়ানো ব্যবহার দেখে এবং আমাদের কথাবার্তা শুনে বেচারা একদম ঘাবড়ে গিয়েছে। তাই কৈফিয়তের সুরে বললাম, 'বৌমা, এদের সঙ্গে ভালো করে কথা বললে এরা একেবারে মাথায় উঠে বসে। এরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। যে পুজোর যে নৈবেদ্য আর কি। বাবা বাছা বলো, ওরা গতর নাড়বে না! অথচ চোখ রাঙিয়ে খারাপ গালাগালি করে তেড়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে পুরো কাজ পেয়ে যাবে।'

নীলিমা বোধ হয় সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। কেননা কথার উত্তর না দিয়ে সে ভয়ে ভয়ে শুধু আমাদের দু'জনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে নীলিমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কতদূর গিয়েছিলে?'

শুনলাম হাঁটতে হাঁটতে ওরা অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। সারারাত শিশিরে-ভেজা কম বয়সের নরম নরম ঘাসগুলোকে নীলিমার এতো ভালো লেগেছিল যে, চটিটাকে সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে খালি পায়ে হাঁটতে আরম্ভ করেছিল। কোহিনূর অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বারণ করে বলেছিল, 'খুব সাবধান। শেষে পা ফুটো করে হুকওয়ার্ম ঢুকবে। আর ওই জিনিস একবার দেহে ঢুকলে পেটটা ক্রমশঃ মোটা হবে, এবং শরীরে হাড় আর চামড়া ছাড়া কিছুই থাকবে না।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু চটিটা কুড়িয়ে আনলো কে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

প্রথমে প্রকাশ করতে রাজী হয়নি, কিন্তু জেরার চাপে কোহিনূরকে স্বীকার করতেই হলো, সে-ই চটিটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে শ্রীমতীর পায়ে পরিয়ে দিয়েছে। লজ্জায় রাঙা হয়ে নীলিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাঁবু-ফাটানো হাসিতে ভেঙে পড়ে আমি বললাম, 'এতে লজ্জার কিছু নেই। চিরকালই এই হয়ে এসেছে, এই তো আইন.।'

লজ্জাবিধুরা নববধুর আরও অনেক কীর্তি কাহিনীর বিবরণ তখন আমি শুনলাম!

লাল-ফুলে-ঢাকা পাহাড়ের কোল দেখে নীলিমা নাকি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল—'ঠিক যেন দূর পাহাড়ের গায়ে কে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।'

ছোট্ট মেয়ের মতো সে পাহাড়ের দিকে ছুটতে আরম্ভ করেছিল। শেষ পর্যন্ত কোহিনূরকে বোঝাতে হয়েছিল, ঐ পাহাড়টা কাছে মনে হলেও, আসলে অনেক দূরে।

চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে কোহিনূর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, ঐ পাহাড়টা আঠারো মাইল দূরে নয়? ও আমার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করছে না।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ বৌমা, পাক্কা আঠারো মাইল। ওইখানেই তো কোহিনূরের এলাকা শেষ হলো। ওর ওধারেও আমাদের লাইন তৈরী হচ্ছে।'

এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'পাহাড়টা, বৌমা অপূর্ব। জায়গাটা আমাদেরই যখন ভালো লাগে, তখন তোমরা যারা কবিতাটবিতা লেখো তাদের নিশ্চয় আরও ভালো লাগবে।'

কোহিনূরকে বললাম, 'বৌমাকে একদিন ওখানে নিয়ে যেও। গাড়ির তো আমাদেব অভাব নেই।'

তারপর আবার বৌমাকে বললাম, 'কনস্ট্রাকশনেব কাজে ঐ একটা সুবিধে। জীপ চাইলেই পাওয়া যায়। যতো ইচ্ছে ঘুরে বেড়াও, অডিটের সাধ্য নেই ট্যাঁ ফোঁ করে।'—অবিনাশবাবু এবার চুপ করলেন।

অবিনাশ হালদার ডি-ই-এন-এর গল্প অনেকক্ষণ ধরেই শুনে যাচ্ছিলাম। গল্পের ঝোঁকে কত সময় যে কেটে গিয়েছে খেয়াল করিনি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবিনাশবাবু আমাকে বললেন, "বেশ রাত হয়ে যাচ্ছে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তবে গরীবের এখানেই রাত্রের খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নিন না। আপনাদের ফিরে যাবার ট্রেন তো আগামী কাল সকাল এগারোটায়।"

আমি আপত্তি করলাম না। বেয়ারাকে প্রয়োজনীয় আদেশ দিয়ে উনি আবার আরম্ভ করলেন।

বললেন, "ঐ যে ওদের পাহাড়ের গোড়ায় বেড়াতে যেতে বললাম, সেইটাই আমার ভুল হয়েছিল। ওটা না বললে হয়তো আজকে আপনাকেও এ-সব শুনতে হতো না।"

আরাম কেদারায় সোজা হয়ে বসে উনি হঠাৎ মাথা চুলকোতে লাগলেন। তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে অবিনাশবাবু

বললেন, "আসলে আমার কী মনে হয় জানেন? বিয়ে করার পর পুরুষদের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি কিছুদিনের জন্য একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। তার উপর স্ত্রী যদি নীলিমার মতো মিষ্টি মেয়ে হয় তাহলে তো কথাই নেই! তখন মোরগদের মতো মাথার ঝুঁটি নাচিয়ে আর গলা ফুলিয়ে নিজের বাহাদুরী দেখাবার একটা অদম্য খেয়াল মাথায় চেপে বসে।"

একটু ভেবে নিয়ে অবিনাশবাবু বললেন, "সপ্তাহখানেক পরের কথা। একদিন বেলা দুটোর সময় তিন নম্বর ব্রীজের কাছে কাজ হচ্ছিল। মাপজোখের যন্ত্রপাতি নিয়ে আমরা দু'জনে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কোহিনূর একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। তারপরই ক্যাম্পে ফিরে যেতে চাইলে। কাগজপত্র গুটিয়ে যাবার সময় বললে, 'আজ আর ফিরবো না।'

ওর ক্যাম্পে ফিরে যাবার ব্যস্ততা দেখে রসিকতা করে বললাম, 'কী? উনি কি অভিমান করেছেন? যাও যাও, তাড়াতাড়ি মান ভাঙাতে না পারলে মুস্কিল হতে পারে!'

মুচকি হেসে শ্রীমান তো বিদায় নিলেন। কিন্তু তখনও যদি বলতো আমায়।" অবিনাশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"কী বলতো?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"তাই তো বলছি। ওর ড্রাইভার দু'দিনের ছুটি নিয়ে গেছে। তা আমায় বললেই তো আমার ড্রাইভারকে ছেড়ে দিতাম, কিন্তু তা নয়। ড্রাইভার থাকলে যে নিজেদের কথাবার্তার অসুবিধে হবে। কোহিনূর নিজেই গাড়ি চালিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। ভেবেছিল, এই রেল কোম্পানির রাজত্বে কোন্ পুলিশ আর রেলের গেজেটেড্ অফিসারের ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা করে দেখবে। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, ঠিক সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।"

"মানে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

অবিনাশবাবু আবার বলতে শুরু করলেন। "পাহাড় পর্যন্ত

জীপ চালিয়ে গিয়ে ওরা দু'জনে কতক্ষণ ঝর্ণার ধারে বসেছিল জানি না। কখন যে সূর্য অস্ত গিয়েছে তাও ওরা খেয়াল করেনি। স্বামীর কোলে মাথা রেখে নীলিমা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছিল। আর চোখ বুজে কোহিনূর তা শুনছিল। এদিকে সমস্ত আকাশ যে মেঘে ছেয়ে গিয়েছে সেদিকে কারুরই নজর পড়েনি। খেয়াল হলো যখন হঠাৎ ঝম ঝমিয়ে বৃষ্টি সুরু হলো।

এ সবের কিছুই অবশ্য আমি জানতাম না। সাড়ে সাতটা নাগাদ ক্যাম্পের ভিতর গেঞ্জি আর লুঙি পরে বসে আছি। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। এমন সময় হ্যারিকেন-হাতে একটা লোক এসে হাজির। প্রশ্ন করলাম, 'কী ব্যাপার ?'

বললে, 'থানায় খবর দিতে যাচ্ছি, আর সেই পথে আপনাকেও জানিয়ে দিয়ে যাই ভাবলাম।'

'কী হয়েছে ?'

তার উত্তরে যা শুনলাম, তাতে আমার বুকটা ছাঁত করে উঠলো। 'এ্যাক্‌সিডেন্ট। রানীবেড়ার ছোটো ইঞ্জিনীয়ার সায়েবের জীপ উল্টিয়েছে। ইঞ্জিনীয়ার সায়েবের চোট লেগেছে। লোক খুন হয়েছে।'

'আর মেমসাব ?' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'ওঁর কিছু হয়নি। একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছেন।'

বৃষ্টি আরও জোরে নেমেছে। বাইরে শোঁ শোঁ করে আওয়াজ দিয়ে ঝড়ও বইছে। বর্ষাতি পরে, তারই মধ্যে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ওরা প্রাণে বেঁচেছে শুনে যেমন আনন্দ পেয়েছি, তেমনি ভয়ও পেয়েছি—যদি কোহিনূর নিজে গাড়ি চালিয়ে থাকে তবে কী হবে! আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পুলিশ এসে হাজির হবে—আমার ভাবতেও ভয় করতে লাগল। চোখের সামনে যেন উল্টেপড়া জীপ গাড়িটা দেখতে পাচ্ছি। একটা লোক চাকার তলায় চেপ্টে মরে পড়ে রয়েছে। তারপর বিনা লাইসেন্সে সরকারী জীপ চালানোর

অপরাধে কোহিনূর মিত্রের গ্রেপ্তার। আমার দেহের সমস্ত লোমগুলো যেন অজানা আশঙ্কায় খাড়া হয়ে উঠলো। কোর্টের শাস্তিতেই অপরাধের শেষ হবে না। চীফ ইঞ্জিনীয়ার হয়ে যে রিটায়ার করবার স্বপ্ন দেখছিল, তাকে জেলখানা থেকেই সোজা বাড়ি ফিরে যেতে হবে! আদালতে শাস্তি হলে সরকারী চাকরি থাকে না।

যখন ক্যাম্পে পৌঁছুলাম, তখন বাইরে দু-চারটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডাক্তার এসে কোহিনূরকে ইঞ্জেকশনে অচৈতন্য করে রেখে চলে গিয়েছেন। ঘণ্টাখানেক পরে আবার আসবেন বলে গিয়েছেন। কিন্তু মেমসায়েব? মেমসায়েব কই?

শুনলাম অনেকক্ষণ আগে বৃষ্টির মধ্যে মেমসায়েব বেরিয়ে গিয়েছেন। কোথায় গিয়েছেন, কেউ জানেনা। কীভাবে এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে, লোকগুলো তাও বলতে পারল না। শুধু শুনেছে গাড়িটা বৃষ্টির জলে পিছলে একটা কুঁড়ে ঘরকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়। ভিতরে একটা লোক ও তার মেয়ে ছিল—দু'জনেই শেষ।

এমন বিপদে আমি কখনও পড়িনি। তাহলে মেমসায়েব কী ঐ জীপের কাছে ফিরে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন নাকি? লোকগুলো কোনো খবরই রাখে না! এদিকে পুলিশ এসে পড়তেও বেশী দেরি নেই। বর্ষাতিটা গায়ে চাপিয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে আবার বেরিয়ে পড়লাম।

কিছুদূর যেতেই মনে হলো জল ভেঙে ছপাৎ ছপাৎ আওয়াজ করতে করতে কে যেন আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। টর্চের আলো ফেলেই আমি চমকে উঠলাম। একি! নীলিমা! ওর সমস্ত দেহটা জলে ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে। শাড়িটাও যেন ছিঁড়ে গিয়েছে মনে হলো।

আমাকে দেখে নীলিমা একটু ভরসা পেল বোধ হয়। কোনো রকমে বললে, 'আপনি এসেছেন!' তারপর প্রায় জ্ঞানহীন হয়ে আমার বুকের উপর আছড়ে পড়লো।

ওর ঐ ভিজে শরীরটাকে কোনো রকমে সোজা করে, বললাম, 'নীলিমা, এখন ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। তোমাকে অনেক শক্ত হতে হবে। সামনে আরও বড় বিপদ অপেক্ষা করছে।'

নীলিমা ফুঁপিয়ে উঠলো। 'তা জানি, উনি জ্ঞান হবার আগে সেই কথাই কয়েকবার বিড়বিড় করে বললেন।'

ওকে প্রায় কোলে করেই আমি আমার জীপের মধ্যে নিয়ে এলাম। কিছু জরুরী কথাবার্তা সেরে নিতে হবে। কিন্তু ওর সর্ব শরীর তখন কাঁপছে। উত্তেজনায় ওর বুকটা হাপরের মতো উঠছে আর নামছে। বললাম, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

উত্তরে ও যা বললে, তা আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না।

কলকাতায় ওদের গাড়ি আছে। চাপা দিলে অনেক সময় আসল ড্রাইভারকে পাচার করে দিয়ে অন্য ড্রাইভারকে সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়। একদল লাইসেন্সওলা ড্রাইভার আছে যাদের পেশাই হলো অপরের দোষ স্বীকার করে জেলে যাওয়া। নীলিমা অসাধ্য সাধন করেছে। এই জনমানবহীন এলাকায় একটা ড্রাইভারকে জোগাড় করেছে। সেই আধা-বাঙ্গালী আধা-নেপালী লোকটা—হরিয়া। সে এখনই আসছে। সে-ই বলবে, সে গাড়ি চালাচ্ছিল"—অবিনাশবাবু আবার একটু দম নিলেন।

আমি বললাম, "তারপর?"

"তারপর আর বলবেন না। ওদিকে জ্ঞানহীন রোগী পড়ে রয়েছে। কিন্তু সেদিকে নজর না দিয়ে আপিসে এসে হাজির হলাম। ইতিমধ্যে হরিয়াও এসে পড়লো। লোকটা খিল খিল করে হাসছে। যে লোকটা আমাকে দেখলে ভয়ে পালাতো, সেই আজ বুক ফুলিয়ে আমার সামনে চেয়ারে এসে বসলো।"

বললে, 'একটা সিগারেট দিন।'

সিগারেট দিলুম। তারপর তিন-চার দিনের আগের তারিখে ওকে ড্রাইভারের চাকরিতে ভর্তি করে, হাজরি খাতায় সই করিয়ে নিলাম।

লোকটার কিন্তু কোনো দিকেই খেয়াল নেই। বেপরোয়া ভাবে তিন-চারটে সই করে দিয়ে, আমারই সামনে পকেট থেকে খেনো মদের বোতল বার করে গিলতে লাগল।

উত্তেজনায় আমারও মাথার ঠিক ছিল না। বুদ্ধিসুদ্ধি যেন একেবারে লোপ পেয়ে গিযেছিল। অথচ মন্ত্রের মতো কাজ করে গেলাম। এরই মধ্যে পুলিশ এল, অনুসন্ধান করলো, তাদের অন্যান্য কাজ শেষ করলো। প্রতি মুহূর্তে ভয় হয়েছে হরিয়া যদি বেঁকে বসে। হঠাৎ যদি বলে বসে, আমি এর মধ্যে ছিলাম না।

লোকটা কিন্তু ঘরের এক কোণে ডালকুত্তার মতো বসে রইল। খাতির করে আস্তে আস্তে হরিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছি, কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা। লোকটা তখনও হাসছে। গোল গোল চোখ দুটো ঘুরিয়ে বললে, 'আর কুচ্ছু দরকার নেই। যা দরকার ছিল সব লিয়ে লিয়েছি।'

অন্য লোকের সামনে জিজ্ঞাসা করা যায় না। কিন্তু ভাবে বুঝলাম, ব্যাটা অনেক টাকা নিয়েছে।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে পুলিশ যখন হরিয়াকে গ্রেপ্তার করে চলে গেল, তখন যেন স্বাভাবিক সম্বিত ফিরে পেলাম। নীলিমা তখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঐ মোমের পুতুলটার মধ্যে এতো শক্তিও ছিল ; আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

অন্য লোকজন চলে যেতে, আস্তে আস্তে বললাম, 'ড্রাইভারটাকে যোগাড় না করতে পারলে আজ যে কী হতো! ধন্য মেয়ে তুমি মা।'

দেখলাম উত্তেজনায় ওর দেহটা থর থর করে কাঁপতে আরম্ভ করলো। অনেকক্ষণ আগেই অবশ্য তা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার কর্তব্য করতে হবে, কোহিনূর এখন অসুস্থ। বললাম, 'লোকটাকে রাজী করালে কী করে? কত লাগল? আমার কাছে টাকা আছে, চাইতে লজ্জা কোরো না।'

কিন্তু কী যে হলো, ওর দেহটা হঠাৎ জ্ঞানহীন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আমি অবশ্য অবাক হইনি। যে কোনো মেয়েই এই অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়তো। সব সহ্য করে এতোক্ষণ যে স্বাভাবিক অবস্থায় সে দাঁড়িয়েছিল এটাই আশ্চর্য।

মুখে চোখে কয়েকবার জলের ঝাপটা দিতেই নীলিমা আবার উঠে বসলো। বললাম, 'যাও মা, একটু বিশ্রাম করগে যাও।'—অবিনাশবাবুও, অনেকটা কথা বলে এবার একটু বিশ্রামের জন্য নীরব হলেন।

অবিনাশবাবুর বর্ণনা শুনে আমার মানসপটে নীলিমা মিত্রের একটা উজ্জ্বল ছবি ভেসে উঠলো! লম্বা ছিপছিপে টুকটুকে ফর্সা, সংসার-অনভিজ্ঞা একটি কাঁচা বয়সের মেয়ে স্বামীকে রক্ষা করে অচৈতন্য হয়ে মেঝেতে পড়ে রয়েছে।

অবিনাশবাবু আবার আরম্ভ করলেন। বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, "আপনারা চিন্তাশীল লোক, বলুন তো স্ত্রী অর্থাৎ সহধর্মিণী, এর থেকে স্বামীর আর কী উপকার করতে পারে?"

"এই জন্যই তো আজকাল ছেলেরা দায়িত্ববোধসম্পন্না মেয়ে বিয়ে করতে চায়," আমি বললাম।

অবিনাশবাবু বললেন, "পরের দিন ওঁদের খবর নিতে এসে দেখলাম, তাঁবুর বাইরে ভিজে চুলগুলো এলিয়ে দিয়ে নীলিমা উদাসভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মনটা যেন দেহের মধ্যেই ছিল না। আমার ডাকে চমকে উঠে ভিতরে এল।

কিন্তু কোহিনূরের কাছে মেয়েটা কিছুতেই যেতে চাইল না। বললে, 'আমার ভয় করছে, আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।'

আমি তো অবাক। যে মেয়ে দেড় মাইল পথ জলে ভিজে আধঘণ্টার মধ্যে একটা আসামী পালটিয়ে দিল, তার এখনও ভয় লাগছে!"

একটু পরেই আবার পুলিশ এল। আমার আর নীলিমার সঙ্গে গল্প করতে করতে দারোগা বললো, 'ব্যাটাকে কিছু মারধোর দিয়েছি। আজই চালান করে দেবো। তবে মিঃ হালদার, ঐ ব্যাটার যা রেকর্ড দেখলাম, অতি লক্কড় ড্রাইভার। আপনাদের তো সুবিধে রয়েছে, হেড আপিস থেকে একটা ভালো ড্রাইভার আনিয়ে নিন। ভাবুন তো, আর একটু এদিক ওদিক হলেই মিষ্টার এণ্ড মিসেস মিত্রের কী অবস্থা হোত!'

নীলিমা সাব-ইন্সপেক্টরের দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ হাত কেঁপে খানিকটা চা চল্কে পড়ে গেল। আমি বললাম, 'ভগবান ওঁদের রক্ষে করেছেন।'

সাব-ইন্সপেক্টর নীলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনার জন্য আমরা সত্যই দুঃখিত। দু'দিনের জন্য বেড়াতে এসে এমন ফ্যাসাদে পড়লেন।'

'না না, ভগবানই আমাদের রক্ষা করেছেন।' নীলিমা কোনো রকমে বলেছিল।

সাব-ইন্সপেক্টর বিদায় নিতে, দেখলাম ওই ঠাণ্ডাতেও নীলিমা ঘামছে। ওর ব্লাউজের হাতা দুটোর প্রায় সবখানিই ভিজে কালো হয়ে উঠেছে।"

অবিনাশবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোহিনূরের তখন অবস্থা কেমন?"

বললেন, "ওর তো এমন কিছু লাগেনি। দু'একদিনের মধ্যেই ভালো হয়ে উঠলো। কিন্তু সেই থেকে মেয়েটার যে কী হলো। একেবারে যেন পালটিয়ে গেল। সারাক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরেও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, কোহিনূরকে পর্যন্ত ভয় পায়। ওর কাছে যেতে চায় না।

অমন সাহসী মেয়েব যে কেন হঠাৎ এমন পরিবর্তন হচ্ছে বুঝতে পারলাম না।"

কিছুদিন পরে এসে নীলিমাকে প্রায় চিনতে পারি না। অমন সুন্দর গোলাপী রঙের ওপর কে যেন আলকাতরা মাখিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সেদিন লোকটার জেল হয়ে যাবার খবর নিয়ে এসেছিলাম। সঙ্গে করে মিষ্টি এনেছিলাম—জাগ্রত কালীর প্রসাদ। বললাম, 'এতোদিনে বাঁচা গেল। আর কোন ভয় নেই।'

কোহিনূরও তখন আবার সেই পুরনো যুগে ফিরে গিয়েছে। খাকি প্যাণ্ট আর সাদা হাফসার্ট পরে কাজে যাবে ভাবছিল। বললে, 'সত্যি, নীলিমা, আমাকে যে কীভাবে রক্ষা করলে তুমি। ভাগ্যিস তুমি এই ক্যাম্পে এসেছিলে।'

নীলিমা চুপ করে রইল।

কোহিনূর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'জানেন, বাড়িতে অতো টাকা ছিল না। নীলিমা লোকটাকে নিজের বালা জোড়া খুলে দিয়ে এসেছে। পাথরবসানো বালা--ওর বাবা দিয়েছিলেন। অন্ততঃ বার শ টাকা দাম।'

আমি বললাম, 'বার শ টাকা! তবে দুঃখ করবার কিছু নেই, চাকরিটা থাকলে অমন অনেক বার শ টাকা তুমি রোজগার করবে।'

কোহিনূর বললে, 'আজই আমি ডাকে কলকাতায় আর এক-জোড়া বালার অর্ডার দিচ্ছি—ঠিক ঐ রকম দেখতে। ওর থেকেও দামী পাথরবসানো।'

নীলিমা কোনোরকমে বললে, 'না না, কিচ্ছু দরকার নেই।'

'তা হয় না। তাছাড়া বালাজোড়া না থাকলে ওর হাত দুটো বড্ডো ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়। তাই না মিঃ হালদার?'

বালাশূন্য হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে নিজের মতামত দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু নীলিমা হঠাৎ যেন তীব্র যন্ত্রণায় ওর মাথাটাকে চেপে ধরলো। শরীরটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

কোহিনূর জোর করে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিলে। বললে,

'পুরো বিশ্রাম নাও। চলো, কালই বরং তোমাকে কলকাতায় রেখে আসি। ওখানে কিছুদিন থাকলেই শরীরটা ভালো হয়ে যাবে।'

সেদিনের মতো বিদায় নিলাম। তারপর কয়েক দিন বেজায় কাজের চাপ। ট্রায়াল ট্রেন চালানো আরম্ভ হয়েছে নতুন লাইনের উপর দিয়ে। এখন কয়েকদিন কয়েক রাত ভারী ভারী মালবোঝাই লম্বা লম্বা মালগাড়ীকে এই লাইনে পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

সে এক অদ্ভুত আনন্দ। আমাদের এতোদিনের পরিশ্রমের পর হাজার হাজার বছরের নীরবতা ভঙ্গ করে এই মালভূমিতে প্রথম ইঞ্জিনের বাঁশী বেজে উঠলো।

কোহিনূরের সঙ্গে দেখা হতে নীলিমার খবর জিজ্ঞাসা করলাম। কোহিনূর অস্বস্তির সঙ্গে বললে, 'নীলিমার কী যে হলো বুঝতে পারছি না। কিছুতেই কলকাতায় যাবে না।, শরীরটাও যেন…?'

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'তুমি অযথা চিন্তা করছো। এবারের শরীর খারাপের সঙ্গে জীপ এক্সিডেন্টের হয়তো কোনো সম্পর্কই নেই। বৌমার বাচ্চাটাচ্চা হবার কোনো সম্ভাবনা…?'

কোহিনূর গম্ভীর হয়ে গেল। বোধহয় আমার ঐ ধরণের ইঙ্গিতে লজ্জাও পেল। বললে, 'না, সে রকম কোনো সুযোগ তো আমরা নিইনি।'

'বৌমার মনের জোর তো খুব, ভাই। ও মেয়ে তো ভেঙে পড়বার মেয়ে নয়।' আমি বললাম।

'কিন্তু কি যে হয়েছে। আমাকে দেখলে আরও ভয় পেয়ে যায়। সারাক্ষণ ক্যাম্পের বাইরে বসে বসে ব্রীজের উপর দিয়ে নতুন রেলগাড়ি চলা দেখে।'

'তা দেখুক। রেলের লোকেরাই শুধু রেলগাড়ী দেখে আনন্দ পায় না, তা ছাড়া আর সবার কাছেই ওটা একটা আশ্চর্য জিনিস।' আমি বললাম।

অবিনাশ হালদার আবার একটু থামলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। গল্প, নাটক, উপন্যাসে চরিত্রের হাবভাব, চালচলন, ব্যবহার থেকে আমরা তার ভবিষ্যৎটা সহজেই আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু সংসারে আমরা কখনই সে বিদ্যাটা কেন খাটাই না।"

আমি বললাম, "কেন বলুন তো ?"

"যদি খাটাতে পারতাম তা হলে হয়তো একটা গুণবতী মেয়ের জীবন রক্ষা হতো। ওর মনের অবস্থা দেখে আমার একবারও সন্দেহ হয়নি যে নীলিমা আত্মহত্যা করবে। রেলের চাকার তলায় পড়ে অমন ভাবে দামী জীবনটা নষ্ট করবে।"

"শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করলো ?" আমি চমকে উঠেছিলাম।

"দাঁড়ান। আপনি হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। আমাদের যে অতো সাহিত্য-টাহিত্য আসে না," বলে অবিনাশবাবু হঠাৎ উঠে পড়লেন। ক্যাম্পের এক কোণের বাক্স থেকে একটা দলাপাকানো কাগজের বাণ্ডিল বার করলেন।

চেয়ারে বসে বললেন, "মশাই, আমি সংসারী লোক। গভর্নমেণ্ট সার্ভিস করি। এ-চিঠিটা লুকিয়ে রাখবার জন্য আজও হয়তো পুলিস আমাকে ধরতে পারে। কিন্তু মশাই, কেমন যেন মায়ায় পড়ে গিয়েছিলাম। ওর মুখটা মনে পড়লে আজও আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে। আমাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতো।"

বাণ্ডিলটা সোজা করতে করতে অবিনাশবাবু বললেন, "বৌমা অতো বুঝতো, অতো জ্ঞান ছিল, আর মা আমার এইটুকু বুঝলে না। আমাকে বললে না কেন ? আমি সব ঠিক করে দিতাম।"

কান্নায় অবিনাশবাবুর গলাটা বোধহয় বন্ধ হয়ে আসছিল। কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, "সেদিনও সন্ধ্যের সময়। সারাদিন পরিশ্রমের পর একটু গল্প করবার জন্য কোহিনূরের টেণ্টে

যাচ্ছিলাম। সেই সময়েই খবর পেলাম। সর্বনাশ হয়েছে—ছোট ইঞ্জিনীয়র সায়েবের বৌ ট্রেনে কাটা পড়েছেন।

ছুটতে ছুটতে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ে দেখি কোহিনুর বসে রয়েছে। ওর সমস্ত দেহটা থরথর করে কাঁপছে। হাতে এই চিঠিটা।"

চিঠিটা আমার দিকে অবিনাশবাবু এগিয়ে দিলেন। লাইনটানা নীল চিঠির কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে পরিচ্ছন্ন হাতে লেখা।

...আমাকে তোমরা ক্ষমা কোরো। গতরাতে আমাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে তুমি যখন বললে, 'তুমি আমার লক্ষ্মী বৌ, আমার সোনা বউ', তখনই আমার বলা উচিত ছিল, আমি মিথ্যেবাদী, আমি খুব খারাপ। আমি তোমার সোনা বউ হয়তো একদিন ছিলাম, এখন আর নেই। কিন্তু বলবার সাহস হয় নি।

মনে আছে প্রথম যেদিন ভোরে এখানে আমরা দু'জনে হাত ধরাধরি করে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম? দূরের পাহাড়, বন, কুলিদের হোগলার চালা দেখিয়ে তুমি বলেছিলে, এ সবেরই কর্তা তুমি। তুমি বলেছিলে, ইচ্ছে করলে ঐ পাহাড়টার আধখানাও ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারো তুমি। আমি লজ্জার মাথা খেয়ে, তোমার দুটি হাত চেপে ধরে বলেছিলাম, 'না লক্ষ্মীটি'।

তুমি হেসে ফেলেছিলে। তারপর আমার গালে একটা টুসকি দিয়ে বলেছিলে, 'মোমের পুতুল, তোমরা কোনোদিন ইঞ্জিনীয়র হতে পারবে না।'

আমার রাগ হয়েছিল। তোমার হাতে একটা আলতো চিমটি কেটে বলতে যাচ্ছিলাম, 'মোমের পুতুল ছাড়া ইঞ্জিনীয়রা তো আর কিছুই বিয়ে করতে চায় না!'

কিন্তু বলা হয়নি। ঠিক সেই সময়ই তো সজারুর মতো দাড়িওয়ালা সেই লোকটা এসে তোমার কাছে ড্রাইভারের চাকরির উমেদারি করলো। যে-তুমি একটু আগেই গান গাইছিলে, কবিতা পড়ছিলে, সে-ই হঠাৎ যেন পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেলে।

লোকটা আমাদের সেই মিষ্টি সকালটুকুতে বাধা দিয়েছিলো বলে, তুমি যেন কেউটে সাপের মতো ছোবল মারলে। তারপর তোমার পায়ে পড়ে সে যাত্রা কি ভাবে সে রক্ষা পেল তাও মনে আছে।

লোকটাকে দেখলেই ভয়ঙ্কর মনে হতো। দুনিয়ায় ওর যে কেউ কোথাও নেই সে-কথা তোমাদের জীপ ড্রাইভারই পরে আমাকে বলেছিল। কারণ লুকিয়ে লুকিয়ে কয়েকবার আমার কাছে দরবার করতে এসেছে সে। আমি তাড়িয়ে দিয়েছি প্রতিবার—কিন্তু প্রতিবারই সে বলেছে, 'রাণী মা, আমি খারাপ ড্রাইভার নই। টাকা নিয়ে অন্য সায়েবের হয়ে জেল খেটেছি—সেই জন্য লাইসেন্স সাসপেণ্ড ছিল।'

আমি তবুও ও নিয়ে মাথা ঘামাইনি। লোকটাকে দেখলেই আমার যেন কেমন ভয় ভয় করতো। আমাদের ড্রাইভারের কাছে শুনেছিলাম লোকটা মাতাল, লোকটা গুণ্ডা। যাবার আগে লোকটা একদিন বলেছিল, 'তুই রাণীমা না ছাই! লোকের দুঃখ যে বোঝে না সে আবার রাণী সেজেছে!'

এ-সব তোমাকে বলিনি, কারণ শুনলে তুমি যে কী কাণ্ড করতে তা তো আমার জানা আছে। ভোর বেলায় হাত ধরাধরি করে আমরা যখন বেড়াতে গিয়েছি, আমি দেখেছি লোকটা ওর ঘরের জানলা দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাও তোমাকে বলিনি।

যে দিন বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসছিলে, সে-দিন তুমি ডান হাতে ষ্টিয়ারিং ধরে, বাঁ হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে। আমার লজ্জা করছিল। তুমি বলেছিলে, 'লজ্জা কি? সায়েবরা তো এইভাবেই ড্রাইভ করে।'

তুমি আরও মনে করিয়ে দিয়েছিলে—আমি ক্লাশ ওয়ান অফিসারের বউ। আমার হাতটা মুঠোর মধ্যে নিয়েই তুমি একে-ডি ই-এন, ডেপুটি, চীপ, জি-এম, রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বার কত কি হবে। তোমার মনে আছে নিশ্চয়, ঠিক সেই সময়েই

জীপটা যেন কিসের বিরুদ্ধে ধাক্কা মারলো। কী যে হলো, ঠিক প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু আবিষ্কার করলাম আমি অক্ষত আছি, আর তুমি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছ। কিন্তু তার মধ্যেও তুমি ভোলোনি তোমার গাড়ি চালানর লাইসেন্স নেই। জ্ঞান হারাবার আগে যে কথা তুমি বলেছিলে, তা তোমার মনে থাকার কথা নয়। প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বলেছিলে, 'নীলিমা, আমাদের সর্বনাশ হলো।'

সেই মুহূর্তে শুধু আমার নিজের নয়, আরও অনেকগুলো মুখ চোখের সামনে দপ করে ভেসে উঠেছিল—তোমার বৃদ্ধ স্কুলমাস্টার বাবা—যিনি অনেক কষ্টে তোমাকে শিবপুর থেকে বি-ই পাশ করিয়েছেন ; তোমার কলেজে পড়া ভাই, তোমার আইবুড়ো বোন, সবাই তোমার উপর ভরসা করেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা মুখও ভেসে উঠলো—ডালকুত্তাব মতো মুখওয়ালা বেঁটে যে লোকটা ড্রাইভারীর জন্য উমেদারি করতো।

কোথা থেকে তখন যে অতো শক্তি পেয়েছিলাম জানি না। লোক দিয়ে তোমার দেহটাকে ক্যাম্পে ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়েই যে আমি আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম, তা তুমি জান। কিন্তু জান না তারপরই—।

হরিয়া ঘরেতে একলাই বসেছিল। আমাকে দেখেই লোকটা যেন পাগলের মতো হাসতে লাগল। তোমার জীপ দুর্ঘটনার খবর ও আগেই পেয়ে গিয়েছে। বৃষ্টির জলে আমার দেহ তখন ভিজে জবজব করছে। আমার সেই অবস্থা দেখে ওর উল্লাস যেন ভয়ংকর বেড়ে গেল।

'যাও যাও, দেখা হবেনি,' বলে ও আমার মুখের উপরেই দরজা বন্ধ করে দিলে। তারপর জানলা দিয়ে মুখ বার করে ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বললে, 'যাওগো যাও, সুন্দরী, সোয়ামী-কোলে বসে হাওয়া খাওগে যাও!'

আমি তখন ঠকঠক করে শীতে কাঁপছি। আমার উপায় নেই, আমাকে এখানেই শেষ চেষ্টা করতে হবে।

লোকটা কী ভেবে আবার দরজা খুললে। ড্যাবডেবে চোখ দিয়ে আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল—ডালকুত্তা যেন মাংসের একটা বড়ো টুকরো শুঁকে শুঁকে দেখছে। লোকটাকে এতো কাছ থেকে কখনও দেখিনি। গায়ে অসহ্য দুর্গন্ধ। হলদে রঙের চামড়ার ওপর কেরোসিনের ল্যাম্পের আলো পড়েছে। বুকের গেঞ্জিটা প্রায় সবটা ছেঁড়া, আর সেই ছেড়া জায়গা দিয়ে উলকির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

আমার হাতের চুড়ি ও বালা, গলার হার, কানের দুল, ঘড়ি সব খুলে ওর পায়ের গোড়ায় রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলেছি, 'আমাকে দয়া করো। একটা সংসার রক্ষে করো।'

লোকটা সেদিকে নজর না দিয়েই, গাঁজার কল্কেটা বার করে আগুন ধরালো। ব্যাগের মধ্যে কয়েকটা দশ টাকার নোট ছিল, সেগুলোও ওর পায়ের কাছে রাখলাম।

ও আবার হা হা করে হেসে উঠলো। আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। হঠাৎ চাপা-গলায় ও চিৎকার করে উঠলো। অশ্লীল গালি দিয়ে আমার হার, বালা, চুড়িগুলো ফেরত দিয়ে বললে, 'পরে ফেল্ বলছি, না হলে এখনই খুন করবো।'

আমি ভয়ে ভয়ে ওগুলো পরে ফেলে, কাঁদতে লাগলাম। বললাম 'এখনি পুলিশ এসে পড়বে। দয়া করো, তুমি যা চাইবে তাই দেবো।'

লোকটা এবার আমার আরও কাছে এগিয়ে এল। বললে ... হবে না। গতবারে যখন কলকাতার মুখার্জি সায়েব রাঁচী ...লাক চাপা দিলেন, তখন ওঁর বিবির কাছে অনেক টাকা ... এবার ওতে হবে না। এবার অন্য জিনিস চাই…'

তারপর···? আমাকে আর জিজ্ঞাসা কোরোনা। আমার উপায় ছিল না। আমাকে না পুড়িয়ে, তোমাকে, তোমাদের সংসারকে বাঁচিয়ে রাখবার কোনো পথই খোলা ছিল না। ভালো করে ভেবে চিন্তে দেখারও সময় ছিল না। আর একটু সময় নিলে সবই হয়তো দেরি হয়ে যেতো।

আমার বিধ্বস্ত দেহটা বোধ হয় কিছুক্ষণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। কেননা হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আমার চোখে-মুখে কে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। চোখ খুলতে বললে, 'জলদি বেরিয়ে যা। আমি লাইসেন্স নিয়ে যাচ্ছি। শালা সায়েবটা এ-যাত্রা বেঁচে গেল।'

তখনও বোধহয় নেশার ঘোরের মধ্যে ছিলাম। কোথা দিয়ে যে কত সময় কেটে গেল খেয়াল করিনি। যখন শুনলাম তুমি ভালো আছো; তোমার বদলে ঐ লোকটাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে, তখন যেন হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমি কি করেছি।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে তুমি যখন শুনলে তোমাকে জেলে যেতে হবে না, তখন তোমার মুখে যে হাসি ফুটে উঠেছিল, তাতেই আমার সব দুঃখ ঘুচে গিয়েছিল। মনে মনে ঈশ্বরকে প্রণাম করেছিলাম।

কিন্তু তারপরেই যখন তুমি জিজ্ঞাসা করলে, 'লোকটাকে কত দিতে হলো?'

তখনই আমার বুকের মধ্যে আবার হাতুড়ি পেটানো শুরু হলো। তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছিলে, কাজের অছিলায় আমি একবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। বাইরে দাঁড়িয়ে, কী বলবো, ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ হাতের দামী বালা দুটোর দিকে নজর [illegible]। একটু হেঁটে গিয়ে নদীর জলের মধ্যে ও দুটো ফেলে দি[illegible] চলতো। কিন্তু কেন জানি না, পারলাম না। তাড়াতাড়ি [illegible] মধ্যে গিয়ে, মাটির তলায় ও দুটো পুঁতে রেখে ফিরে এলাম।

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, 'এতো দেরি?' আমি বললাম, 'বাথরুমে গিয়েছিলাম।'

তারপর তুমি যখন শুনলে তোমার ভবিষ্যৎ, তোমার মর্যাদা, তোমার সম্মান নিজের হাতের বালা দুটো দিয়ে আমি রক্ষা করেছি, তখন তুমি আমাকে কত আদর করলে। অবিনাশবাবু শুনে বললেন, 'আমি নাকি সাক্ষাৎ সতী সাবিত্রী।'

আমার ভয় হচ্ছিল। বুকের ভিতরটা যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল —তুমি যেন আমার বুকের মধ্যে দু'খানা জ্বলন্ত টিকে জোর করে চেপে ধরেছো। অথচ কে যেন আমার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছে, চেষ্টা করেও চিৎকার করতে পারছি না।

তুমি যখন বললে, কলকাতাতে আমার জন্য বালার অর্ডার দিয়েছো, তখন তোমাকে বারবার বারণ করেছিলাম, তুমি শুনলে না।

আজ সকালে, চা খাওয়ার পরই যে তোমার বাগান করবার শখ চাপবে তা কে জানতো। আর ফুলের বাগানে মাটি খুঁড়তে গিয়েই যে জিনিসটা তোমার হাতে উঠলো, সেটা আমারই একটা বালা। তুমি আমার বালা চেনো। অনেক রাত আমার বালাপরা হাত দুটো নিয়ে তুমি খেলা করেছো। তুমি তো কিছুই বুঝতে পারছিলে না। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমার মুখের দিকে তাকালে। কিছু বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলে।

কিন্তু তার আগেই আমি বললাম, 'এখন নয়, সন্ধ্যাবেলায় বলবো।'

তুমি হয়তো তখনই শোনবার জন্য পেড়াপীড়ি করতে; যদি না ঠিক সেই সময়েই ঠিকাদারদের লোক নিয়ে অবিনাশবাবু এসে পড়তেন। তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন।

অনেক ভেবে দেখলাম। বাঁচতে ইচ্ছে করছে বড়ো, কিন্তু বোধহয় কোনো উপায় নেই। সন্ধ্যাবেলায় তুমি যখন ফিরবে, তখন হয়তো নতুন একটা কিছু গল্প বানিয়ে বলা যেতো। বলা যেতো

লোকটা ওইখানেই বালাদুটো পুঁতে রেখে গিয়েছিল, জেল থেকে ফিরে এসে নেবে। কিন্তু বিশ্বাস করো, হঠাৎ মনে হচ্ছে, এ কি করছি আমি!

তোমাকে মুখ ফুটে সব বলে, বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব! আর এ-সব চাপাও থাকবে না। বালা সম্বন্ধে বানানো গল্পটা হয়তো তুমি আজ বিশ্বাস করবে। কিন্তু দু'মাস পরে ঐ ডালকুত্তার মতো মুখওয়ালা লোকটা জেলখানা থেকে ফিরে আসবে। সে ছাড়বে না। যে-সায়েব তাকে অপমান করেছিল, তার উপর সে যে চরম প্রতিশোধ নিয়েছে, এ-কথা সে জোর করে বলে বেড়াবেই।

[তাও হয়তো তুমি তোমার সরকারী বলে বন্ধ করতে পারবে। কিন্তু আরও বড়ো সাক্ষ্যের ইঙ্গিত রয়েছে আমার দেহে। প্রথমে সন্দেহ ছিল, কিন্তু এখন বুঝেছি একবিন্দু সাক্ষ্যই আমার দেহে ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠছে। তাকে তুমি বা আমি কেউ চেপে ধরে রাখতে পারব না।]

তার থেকে এই ভাল। তোমাদের নতুন লাইনে যখন মালগাড়ি চলতে শুরু করেছে তখন আর চিন্তা কী?—ইতি।"

পড়া শেষ করে অবিনাশবাবুর মুখের দিকে তাকাতেই উনি চিঠিটা আমার হাত থেকে নিয়ে নিলেন। বললেন, "দেখুন, যে অর্থে লোককে সৎ বলা যায়, আমি তা নই। আমি যাদের ভালবাসি, তাদের জন্য আমি পাপ করি। তাদের জন্যে আমি নরকে যেতেও রাজী আছি। এ-চিঠিটাও আমি পুলিশের হাতে দিইনি। কোহিনূরও কাছে রাখেনি তখন—বলা যায় না, কোনদিন হয়তো খানাতল্লাশ হতে পারে।

পুলিশের রিপোর্টে লিখিয়ে দিয়েছি অসাবধানে লাইন পেরোতে গিয়ে দুর্ঘটনা। রান-ওভার কেস, সুতরাং হেড আপিসে রিপোর্ট পাঠাতে হলো। সেখান থেকে হুকুম এল—"দুর্ঘটনার জায়গায় নোটিশ বোর্ড টাঙিয়ে দাও।"

এক দুই তিন

অনেক রাত্রে আমাদের প্রেস ক্যাম্পে ফিরবার পথে, লাইনের ধারে এক জায়গায় জীপটা থামিয়ে মিঃ হালদার গম্ভীরভাবে একটা বড়ো সাইন বোর্ড দেখালেন। সেখানে লেখা—"সাবধান! যে কেহ এই বিপজ্জনক স্থানে রেলপথ অতিক্রম করিলে, তাহা সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে করিবেন।"

মিঃ হালদার গাড়িতে আবার স্টার্ট দিয়ে নিজের মনেই বললেন, "এ-কথা লেখার কোনো মানে হয় না। জীবনে সব পথই যে নিজ দায়িত্বে অতিক্রম করতে হয় তা আমার বৌমা ভালভাবেই জানতেন।"

॥ দুই-এ পক্ষ ॥

এবার এলিজাবেথ, গদাধর এবং সমীরণ চ্যাটার্জীর গল্প।

বাড়ির নাম গোল্ডেন-ভিউ। জায়গার নাম? সে থাক না। ভ্রমণ-উৎসাহীরা ভারতবর্ষের ম্যাপ দেখে সহজেই তা বার করে নিতে পারবেন।

ভারতবর্ষের মাথার কাছে হিমালয় বলে একটা পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের কোলে একটা ছোট্ট জনপদ আছে, সেই জনপদের একপ্রান্তে একটা বাড়ি আছে, সেই বাড়ির পশ্চিমদিকে একটা জানলা আছে, এবং সেই জানলার ধারেই বসে রয়েছেন সমীরণ চ্যাটার্জী।

কয়েকবছর আগে সমীরণ চ্যাটার্জী যখন এখানে এসেছিলেন, তখন এখানে অনেক বাড়ি খালি ছিল। ম্যালের উপর রোজ-মাউণ্ট, ব্রিজের ওধারে হিল ভিউ, নন্দাদেবী, শাস্ত্রী-ভিলা, আরও অনেক বাড়ি ছিল। ঐসব বাড়ির ব্যালকনিতে বসে বসে উর্বশীর বুকের মতো সাদা বরফে ঢাকা পাহাড় দেখা যায়। ভোরবেলায় সূর্যোদয় দেখা যায়।

গোল্ডেন ভিউ থেকে কিন্তু ওসব কিছুই নজরে আসে না। পশ্চিমের জানলা দিয়ে কেবল প্রতিদিনের সূর্যাস্ত দেখা যায়। এবং সেইজন্যই তো সমীরণ চ্যাটার্জী বাড়িটা পছন্দ করেছেন। তাঁর জীবনের সূর্যও অনেকদিন আগে উদিত হয়েছে, এবার অস্ত যাবার পালা।

এখন ভোরবেলা। এই ভোরবেলাতেই কাঁচের শার্সিওয়ালা পশ্চিমের জানালাটা খুলে দিলেন সমীরণ চ্যাটার্জী। খুলে দিলেই বহুদূরের উপত্যকাটা দেখা যায়।

প্রকৃতি যেন বুঝতে পেরেছিলেন সাতহাজার ফুট উঁচু [illegible] পাহাড়ের মাথা থেকে চারহাজার ফুটের লছমীক্ষেত উপ[illegible]

দিকে সোজা দৃষ্টিপাত করতে সমীরণ চ্যাটার্জীর কষ্ট হবে। ওঁর ক্লান্ত চোখ দুটোর পরিশ্রম লাঘবের জন্যই ভদ্রমহিলা বোধ পশ্চিমের জানলার নিচে থেকেই পাহাড়ের কটিদেশ পর্যন্ত থাকে থাকে সিঁড়ি কেটে দিয়েছেন।

বাড়ন্ত খেলোয়াড়ী ছেলের মতো দেওদার গাছগুলো সমীরণ চ্যাটার্জীর খুব কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন সতেরো-আঠারো বছরের বয়সী ছেলেদের একটা ক্রিকেট খেলার দল। চাঁচাছোলা চেহারা, কোথাও মেদের কোনো বাহুল্য নেই। আগুনে পোড়ানো লোহাকে যেন গরম অবস্থায় পিটিয়ে পিটিয়ে মনের মতন রূপ দেওয়া হয়েছে।

বড়ো বড়ো গাছের সারির পিছনে আর একদল গাছের সারি। মাথায় একটু খাটো, যেন ওদেরই ছোটো ভাই। কিন্তু মিস্টার চ্যাটার্জী জানেন, ওরা ছোটো নয়। হয়তো গজ-ফিতে দিয়ে মাপ নিলে দেখা যাবে প্রথম সারি থেকেও ওরা লম্বা। কিন্তু উঁচু পাহাড়ের বুকে ওদের দৈর্ঘ্য বোঝা যাচ্ছে না।

সামান্য ব্যাপার। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ গাছের জনতা নিয়ে এখানে যে অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে সেখানে বড়ো ছোটো নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। হয়তো সেই সমীরণ চ্যাটার্জী—অনেকদিন আগের মিস্টার সমীরণ চ্যাটার্জী—নিজেও এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু এখন অতিক্ষুদ্র ঘটনা, অতিক্ষুদ্র সংঘাতেই মনের দার্শনিক স্টপ-ওয়াচটা চলতে শুরু করে। তাকে মিস্টার সমীরণ চ্যাটার্জী কিছুতেই বন্ধ করতে পারেন না। যে পারতো, কাছে এসে আদর করে যে বলতে পারতো, 'অতো কী ভাবছো' তাকে আপনারা চেনেন না। তার নাম এলিজাবেথ। সে এখানে নেই। এই পাহাড়ী নিঃশব্দতায় তাই স্টপ-ওয়াচটা নিজের খুশিমতো চলতে থাকে, আর মিস্টার চ্যাটার্জীর মনে হয়, জীবনটা এই দেওদার গাছগুলোর মতো। আকারে ছোটো হয়েও জীবনের ঢালে অনেককে বড়ো দেখায়, আবার বহুজন খাড়ো হয়ে—ওদের থেকে বহু বড়ো হয়েও—সংসারের

হিসাবে চিরদিন ছোটো হয়ে রইল। সংসারের ফরেস্টাররা খালি-চোখেই কে ছোটো কে বড়ো স্থির করে ফেললেন, গজ-ফিতে দিয়ে মেপে দেখলেন না। এই সামান্য কল্পনা থেকেই মিস্টার চ্যাটার্জী আস্তে আস্তে একরাশ নতুন চিন্তার মধ্যে চলে গেলেন।

সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে মিঃ চ্যাটার্জী বুঝতে পারলেন না। সেই সাড়ে আটটার সময় ব্রেকফাস্ট সেরে জানলাটার সামনে এসে বসেছিলেন। ওঁর বিছানার পাশে রাখা টাইমপিসটা নিজের মনে বকতে বকতেই কখন যে ন'টা দশটা, এগারোটা, বারোটা, একটার ঘর পেরিয়ে গেল, মিস্টার চ্যাটার্জী খেয়াল করলেন না। আরও সময় কাটতো যদি না হিমালয় সিং খাকির প্যাণ্ট আর মশলার রঙ-ধরা এপ্রনটা পরে' সামনে এসে দাঁড়াতো।

"হুজুর!"

মিস্টার-চ্যাটার্জী চমকে উঠে, জানলার বাইরে নিবদ্ধ দৃষ্টি ঘরের ভিতরে নিয়ে এলেন।

"হুজুর, লাঞ্চ রেডি।"

"এর মধ্যে? ক'টা বাজল?" মিস্টার চ্যাটার্জী জিজ্ঞাসা করেন।

"একটা বেজে গিয়েছে," হিমালয় সিং তার স্বভাবসিদ্ধ সেনাবিভাগীয় কায়দায় শ্রদ্ধা নিবেদন করে বললে।

আর কিছু বলবার থাকে না। মনে মনে খুশী হলেন মিস্টার চ্যাটার্জী। আর একটা দিন প্রায় কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি। অথচ, এই তো মাত্র কিছুক্ষণ আগে ভোর হলো। জীবনের গতিও ঠিক তেমনি অপ্রত্যাশিত মনে হয়। এই তো সেদিন যেন উনি জীবন আরম্ভ করলেন। অন্যমনস্ক হয়ে কিছুক্ষণ যেন নিজের মধ্যেই নিজে ডুবে ছিলেন। হঠাৎ আর এক বৃহৎ হিমালয় সিং-এর সেলামে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখলেন, সময় কেটে গিয়েছে, বরং দেরি হয়ে গিয়েছে। প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ কাটিয়ে জীবনের সূর্য অস্ত যাবার নোটিশ দিয়েছে, আর সেই নোটিশেই সমগ্র জীবনটা যেন এক মন-কেমন-

করা আভায় রঙীন হয়ে উঠেছে। নাঃ, আজ তিনি কারুর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করবেন না। ওরা যে যেখানে আছে সুখে থাকুক শান্তিতে থাকুক। গদাধর কি বিয়ে করেছে? কে জানে!

"হুজুর।"

"ওঃ, দেরি হয়ে যাচ্ছে, চলো চলো।"

হিমালয় সিং-এর উপদেশ-মতো সমীরণ চ্যাটার্জী তাড়াতাড়ি লাঞ্চ-টেবিলে এসে বসলেন। পুরো বিলিতি কায়দায় হিমালয় সিং টেবিল সাজিয়ে দিয়েছে। স্যুপের প্লেটটা শেষ হতেই সেটা বাঁহাতে আস্তে আস্তে টেবিল থেকে সরিয়ে নিয়ে, ডানহাতে হিমালয় সিং আর একটা চীনা-মাটির প্লেট ওঁর সামনে বসিয়ে দিল। হিমালয় সিং পুরানো আমলের রেজিমেণ্টাল বেয়ারা। সাইক্স সাব-কো ছোকরা বলে এক কালে ওর নাম ছিল। কর্নেল সাইক্স-এর হেড বেয়ারা আবদুলের কাছে তার ট্রেনিং।

লাঞ্চ শেষ করে, ন্যাপকিনে হাত মুছে, মিস্টার চ্যাটার্জী ইজি চেয়ারে এসে বসলেন। হিমালয় সিং সেলাম করে জিজ্ঞাসা করলে, এবার সে খেতে বসতে পারে কিনা।

"নিশ্চয় নিশ্চয়।" মিস্টার চ্যাটার্জী যেন বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রবারের স্লিপারটা পায়ে গলাতে গলাতে বললেন, "আসলে, হিমালয় সিং, তুমি আগে খেয়ে নিয়ে, তারপর আমাকে খাওয়াতে পারো। আমার যখন কিছুরই ঠিক নেই, তখন শুধু শুধু তুমি কষ্ট পাও কেন?"

মুখের উপর 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলবার কোনো শিক্ষাই হিমালয় সিং মিলিটারীতে পায়নি। সায়েবের সামনে দু'এক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে, সে আস্তে আস্তে চলে গেল।

ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথাটা মিস্টার চ্যাটার্জীর মনে পড়ে গেল। রোগা বেঁটে একফোঁটা ঐ লোকটার নাম যে হিমালয় সিং হতে পারে, তা ভাবতেও উনি যেন কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

যেমন এলিজাবেথ একদিন ওঁকে দেখে হয়েছিল। এলিজাবেথের তখন কতই বা বয়েস? উনিশ কিংবা কুড়ি। ওঁর একসাইজ-করা, শাল-গাছের গুঁড়ির মতো শক্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করেছিল, "আচ্ছা, সমীরণ কথাটার মানে কী?"

সমীরণ চ্যাটার্জী প্রথমে একটু ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিলেন, "আমাদের বেঙ্গলীতে এর মানে হলো—soft breeze, very gentle wind."

এলিজাবেথ খিলখিল করে হেসে ফেলেছিল। ইংরিজীতে বিস্ময়-সূচক একটা শব্দ উচ্চারণ করে বলেছিল, "এক্সকিউজ মি, লোহার মতো শক্ত তোমার হাতের মাসলগুলো একটু টাচ্ করে দেখছি। মাই লর্ড, এর মানে সমীরণ!"

কিন্তু এসব তো অনেক দিনের পুরনো কথা। জীবনের ভোরবেলার কথা। এখন তো রাত্রি; বড়োজোর ভদ্রতা ক'রে—সন্ধ্যা বলা যায়। এখন সে-সব দিনগুলোর কথা ভেবে লাভ কী?

এখন সমীরণ চ্যাটার্জী একটু-আধটু লেখাপড়া করেন। এর আগে বই নিয়ে পড়াশুনা করবার সুযোগ বা সময় কোনোটাই পাননি সমীরণ চ্যাটার্জী। কয়েকদিন আগে কলকাতা থেকে ভি-পি ডাকে কয়েকখানা বাংলা কবিতার বই আনিয়েছেন। সেইখানেই তো গতকাল পড়েছেন—

রাত্রে যদি সূর্য-শোকে ঝরে অশ্রুধারা;
সূর্য নাহি ফেরে, শুধু ব্যর্থ হয় তারা।

মিস্টার চ্যাটার্জীর এই রাত্রির আকাশে এখন একটিমাত্র তারা ফুটে রয়েছে। তার নাম হিমালয় সিং। আর সব কবে নিভে গিয়ে রাত্রের আকাশকে আরও ভয়াবহ ও দুর্বিসহ করে তুলেছে।

বছরকয়েক আগে ঘুরতে ঘুরতে সমীরণ চ্যাটার্জী যখন এখানে প্রথমে এসে পড়েছিলেন, তখন জায়গাটা খুব ভালো লেগে

গিয়েছিল। কিন্তু জায়গা সুন্দর হলে কী হয়, মাথা গুঁজবার জায়গা তো মাত্র একটি। স্বামী-পরিত্যক্তা এক বদমেজাজী বৃদ্ধা ফরাসী মহিলা এই সবেধন-নীলমণি হোটেলটি চালান।

হোল্ড্অল ও সুটকেস হাতে করে সমীরণ চ্যাটার্জী যখন ওঁর হোটেলে প্রথম হাজির হয়েছিলেন, তখন ওঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, "আমার হোটেলে আর কিছুই নেই, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে; বরফের টুপি-পরা পাহাড়ের এমন 'এলিওরিং বিউটি' পৃথিবীতে আর কোথাও পাবে না। মান-অভিমান, অভাব অভিযোগ সব ব্যাগের মধ্যে পুরে রেখে, নির্জনে যখন ঐ চিরযৌবনা সুন্দরীর সান্নিধ্য সুখ উপভোগ করবে তখন আমার এই হোটেলের কথাও তোমার মনে থাকবে না।

তখন ভদ্রমহিলার বক্তব্যকে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ইউরোপীয় বিনয় বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সমীরণ চ্যাটার্জী বুঝলেন, ওঁর কথার প্রতিটি অক্ষর সত্য। প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়াও, হোটেলে আরও যা যা প্রয়োজন, যেমন—শোবার জন্য একটা খাট, সামান্য বিছানা, খাবার জন্য দু'একটা পরিষ্কার বাসনপত্র, তা ভদ্রমহিলা বাহুল্যবোধে বর্জন করেছেন। হিমালয়ের মোহিনী মায়ায় সে-সবেরও হয়তো কোনো প্রয়োজন হতো না। কিন্তু একদিন দুষ্ট-পাহাড়ের শিখরে শিখরে শীতের আবির্ভাব ঘোষিত হলো। হোটেল-কর্ত্রী জানিয়ে দিলেন তল্পিতল্পা গুটিয়ে তিনি এবার সমতলভূমিতে নেবে যাবেন। এখানকার শীত শুধু জবরদস্তই নয়, অশালীনও বটে। ফরাসী মহিলাদেরও মানসম্মান রাখে না!

কিন্তু মিস্টার চ্যাটার্জীর জায়গাটা ভালো লেগে গিয়েছিল। পৃথিবীর পথে পথে সারাজীবন ঘুরে বেড়িয়ে, এবার যেন মনের মতো একটা আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন। ডিসেম্বরের শীতটা ওঁর যেন আরও ভালো লাগবে বলে মনে হলো। কিন্তু কোথায় থাকবেন?

সেই সময় হিমালয় সিং-এর সঙ্গে দেখা হলো। নভেম্বর মাসের

ঐ হুল-ফোটানো শীতে সোয়েটার, কোট, ওভারকোট চাপিয়েও যখন হাড়ের কাঁপুনি বন্ধ করা যাচ্ছিল না, তখন একটা ছেঁড়া শার্ট আর খাঁকি প্যান্ট প'রে লোকটা চুপচাপ রাস্তার ধারে বসে ছিল।

মিস্টার চ্যাটার্জী বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। লোকটাকে অমন অবস্থায় বসে থাকতে দেখে সমীরণ চ্যাটার্জী থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এইভাবে খালি গায়ে বসে রয়েছো, তোমার শীত লাগে না?"

তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে, অত্যন্ত বিনীতভাবে সে বলেছিল, "না হুজুর, শীত তো আমাদের ঘরের আদমী।"

"তুমি কী করো?" মিস্টার চ্যাটার্জী জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

"বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে টুরিস্টদের মাল বয়ে ডাকবাংলোতে, কিংবা হোটেলে নিয়ে যাই।"

"তাতেই তোমার চলে যায়? এখানে আর ক'টা লোকই বা আসে?"

"না হুজুর, বিলেত থেকে প্রতিমাসে আমার সাড়ে সাত টাকা করে আসতো। কর্নেল সাইক্‌স প্রতিমাসে পাঠিয়ে দিতেন।"

তারপর মিস্টার চ্যাটার্জী শুনলেন, দু'মাস ধরে তার টাকা আসছে না। টাকা আর আসবেও না। বুড়ো সাইক্‌স সায়েব, নরফোকের সমুদ্রতীরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। হিমালয় সিং অবশ্য তা জানতো। অনেক বয়েস হয়েছিল সায়েবের, কতদিন আর বাঁচবেন? মোট বয়েই হিমালয় সিং কোনোরকমে একটা পেট চালিয়ে দিত, শীতের দিনে তাও বন্ধ হলো।

মিস্টার চ্যাটার্জী তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমি যদি এখানে বাড়ি ভাড়া নিই, তুমি কাজ করবে?"

হিমালয় সিং এক-কথাতেই রাজী হয়ে গিয়েছিল।

সেই থেকেই ওঁরা দুজনে একসঙ্গে আছেন। হিমালয় সিং

মিস্টার চ্যাটার্জীর কেশিয়ার, প্রাইভেট সেক্রেটারি, অ্যাকাউন্টেন্ট, কুক, মশালচি, বাবুর্চি, মালী, বেয়ারা সব-কিছু।

হয়েছে ভালো, মিস্টার চ্যাটার্জী ভাবলেন। ষাটবছরের মাইল-পোস্ট পেরিয়ে, তাঁর দেহটা এখন দ্রুতগতিতে সত্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হিমালয় সিং-এর বয়সও সমনামের পাহাড়ের মতোই বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তবু ভাবতে বেশ লাগে, ওঁরা দুজনেই একসঙ্গে একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

সে লক্ষ্যটা কী? হঠাৎ মিস্টার চ্যাটার্জী নিজেকেই প্রশ্ন করলেন কি জন্য তিনি এখানে অপেক্ষা করছেন? মৃত্যুর জন্য! Waiting to die! সেই রাত্রের জন্য অপেক্ষা করছেন,—'যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের সঙ্গে যায় মিশে'।

না, না, এলিজাবেথ কি কোনোদিন তা ভাবতে পেরেছিল? বার্মিংহামের ব্রাইট লেনের সামনের ছোট্ট পার্কটাতে যখন এলিজাবেথ ও সমীরণ চ্যাটার্জী চুপচাপ বসেছিলেন, যখন ওঁর হাতটাতে চাপ দিয়ে এলিজাবেথ বলেছিল, 'সমীর, বোধহয় তোমাকে আমি সন্তান উপহার দিতে চলেছি', তখন কেউ কি ভেবেছিল যে এমন হবে?

মিস্টার সমীরণ চ্যাটার্জী আরও চিন্তা করতেন, কিন্তু হিমালয় সিং-এর পায়ের শব্দে বুঝলেন চা-এর সময় হয়ে গিয়েছে।

চা-এর সময়টা এখানে একটু সকাল সকাল—সাড়ে তিনটে থেকে চারটের মধ্যে। হিমালয় সিং চা-এর ট্রে-টা সামনের টেবিলে সাজিয়ে দিল। মিস্টার চ্যাটার্জী হঠাৎ হেসে ফেললেন। দিন, মাস বছর দিয়ে না মেপে জীবনকে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, কিংবা টী দিয়ে মাপলেই হয়। দশ হাজার ব্রেকফাস্টের যৌবন, কিংবা কুড়ি হাজার লাঞ্চের বার্ধক্য! চায়ের কাপে চামচটা নাড়তে নাড়তে মিস্টার চ্যাটার্জীর মনে হলো, খাবার জন্যই যেন তিনি বেঁচে রয়েছেন। বেড-টী শেষ করে তিনি ব্রেকফাস্টের জন্য অপেক্ষা করেন; ব্রেকফাস্ট শেষ হলেই লাঞ্চের চিন্তা;

লাঞ্চের পর বিকেলের চা ; তারপর ডিনার ; ডিনারের পর আবার বেড-টী—জীবনচক্র যেন এইভাবেই বার বার আবর্তিত হচ্ছে।

চা শেষ করেও আত্মচিন্তাতে ডুবে থাকবার উপায় রইলো না। হিমালয় সিং বেড়ানোর লাঠি আর টুপিটা হাতে করে নিয়ে, কাছে এসে বললো, "হুজুর।"

মিস্টার চ্যাটার্জী এইসময় একটু বেড়াতে বেরোন। আজও বেরিয়ে পড়লেন।

আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথের ওপর দিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে হেঁটে চলেন মিস্টার সমীরণ চ্যাটার্জী। লাঠির উপর ভর করে আস্তে আস্তে তিনি কয়েক-শ' ফুট নেমে পড়লেন। তারপর বাঁ দিকে বেঁকে যে রাস্তায় এসে পড়লেন সেখান থেকে দূরের উপত্যকাটা চমৎকার দেখতে পাওয়া যায়। যেন কোনো উঁচু বাড়ির তিনতলার বারান্দা থেকে নিচের পার্কের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। কিছুক্ষণের জন্য প্রাণভরে প্রকৃতিকে দেখবার জন্য রাস্তার ধারে বসবার জায়গা রয়েছে। দু'একটা চেঞ্জারের দল সেইখানে বসে জটলা পাকাচ্ছে। সমীরণ চ্যাটার্জীর বৃদ্ধ দেহের দিকে তারা নজর দিলে না। মিস্টার চ্যাটার্জীও সেদিকে তাকালেন না, তাঁর মনের মধ্যে তখন ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার ইত্যাদি শব্দগুলো শুধু বাজছে।

একটা বড়ো পাথরের টুকরোর উপর এসে বসলেন মিস্টার চ্যাটার্জী। পাথর থেকে অন্যমনস্কভাবে হড়কে পড়লে কোথায় নেমে যেতে হবে তাও একবার তিনি দেখে নিলেন।

পাথরের ঢিবিটার উপর বসে মিস্টাব চ্যাটার্জী আবার ব্রেক-ফাস্টের কথায় ফিরে গেলেন। ব্রেকফাস্ট! সারাজীবন তো তিনি ব্রেকফাস্ট খাননি। ব্রেকফাস্ট কাকে বলে তাও তো জানতেন না মা-র কাছে লুচি খাবার জন্য আবদার করতেন। মা বলতেন, রোজ রোজ সকালে লুচি খাওয়া কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? দুপুরের ভাতের জোগাড় করতে হবে তো।

কিন্তু 'সাকসেশফুল ম্যান'দের কাছে শৈশব এবং কৈশোরের দারিদ্র্যস্মৃতিটা একধরণের বিলাসিতা। দারিদ্র্যের মধ্যে জন্ম নিয়ে, দারিদ্র্যের মধ্যে যৌবন অতিবাহিত ক'রে, দারিদ্র্যের মধ্যেই যারা জীবনের হিসেব শেষ করে, তারা কখনও অতীতের অন্ধকার দিন-গুলোর কথা ভেবে আত্মরতির আনন্দ অনুভব করে না। দুরন্ত বর্তমান নিয়েই শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। মিস্টার সমীরণ চ্যাটার্জী তা জানেন। তাঁর বর্তমান নেই। কয়েক বছর আগেই এলিজাবেথই তা শেষ করে দিয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যৎ? সে তো নেই-ই। সেই জন্যই অতীতটুকু সম্বল করেই মিস্টার সমীরণ চ্যাটার্জীকে বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু সে শুধু লুচি খেতে না পাওয়ার স্মৃতি নয়। ছেঁড়া কাঁথায় জীবন আরম্ভ করে কোটি টাকার জীবন শেষ করার গল্প পৃথিবীর সবদেশেই নিতান্ত পুরনো হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু ওঁর জীবনটা? লোকের চোখে ওঁর দেহটাও হয়তো বেজায় পুরনো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওঁর কাছে? ওঁর নিজের কাছে জীবনটা আজও প্রখ্যাত লেখকের সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসের মতোই নতুন এবং ঔৎসুক্যে ভরা হয়ে রয়েছে।

মা বোধ হয় তা জানতেন। না হলে গোবরডাঙার প্রায় পড়ে-যাওয়া একটা একতলা বাড়ির বারান্দায় বসে কেন তিনি বলতেন, "খাওয়াটাই সংসারে সবচেয়ে বড়ো কথা নয়। তোদের বড়ো হতে হবে। অনেক বড়ো।"

বড়ো হওয়া মানে সমীরণ চ্যাটার্জী তখন যা বুঝতেন তা হলো ট্রেনে করে কলকাতায় যাওয়া। শিয়ালদহ-বনগাঁ সেকশনের লোকাল ট্রেন তাঁর জন্মের আগে থেকেই চলতে শুরু করেছে। ঐ ট্রেনে মান্থলি টিকিট কেটে ডেলি-প্যাসেঞ্জার হতে পারলেই যেন জীবনের একটা হিল্লে হয়ে গেল।

কিন্তু ওঁর দাদা বরিষণ চ্যাটার্জী ওঁর থেকে দশ বছর আগে জন্মিয়েও, অনেক আধুনিক হয়ে গিয়েছিলেন। বরিষণদার কল্পনা

শিয়ালদহ স্টেশনের টিনের চালা থেকে বেরিয়ে আরও সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। শুধু মনে-মনেই যাওয়া নয়, স্কলারশিপ যোগাড় করে বরিষণ চ্যাটার্জী একদিন জার্মানীতে হাজির হয়েছিলেন।

ইংরেজদের উপর বরিষণদার বেজায় রাগ ছিল। ওদের তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন হবার কথা বরিষণদা বিদেশে বসে-বসেই ভাবতেন। আর মাকে লিখতেন, "তুমি আমার জন্য অযথা চিন্তা কোরোনা মা। এখান থেকে প্রতি মাসেই কিছু টাকা পাঠাতে পারবো। তা ছাড়া সমীরকেও এখানে পাঠিয়ে দাও। ইংলণ্ডে ওর ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে ফেলেছি।"

বরিষণদা লিখতেন, "জানো মা, এরা আমাদের প্রতিভা দেখে অবাক হয়ে যায়। ঘুঁটের ধোঁয়া, ম্যালেরিয়া আর আমাশয়ে-ভরা ভারতবর্ষে যে মানুষ জন্মাতে পারে, তা এদের বিশ্বাসই হয় না। অথচ যখন কেমিক্যাল টেক্‌নোলজিতে আমার সঙ্গে আলোচনায় পেরে ওঠেনা, তখন জিজ্ঞাসা করে, "ইণ্ডিয়াতে তোমার মতো ছেলে আরও আছে?"

বরিষণদার প্রত্যেকটা চিঠি মা যত্ন করে রেখে দিতেন। আর একটা চিঠি না আসা পর্যন্ত শেষ চিঠিটা আঁচলের খুঁটে বেঁধে রেখে দিতেন। সময় পেলেই, আঁচল খুলে চিঠিটা বার করে পড়তেন। বললেন, "হ্যাঁরে খোকা, তোরা দুজনেই যদি চলে যাস, তা হলে আমি থাকবো কী নিয়ে?"

কিন্তু মার বুদ্ধি ছিল। দুটি ছেলে নিয়ে অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছিলেন। লেখাপড়া বিশেষ শেখেননি, গোবরডাঙার বাইরে কোথাও যাবারও সুযোগ হয়নি কখনও, তবুও সবই বুঝতেন।

মা বলেছিলেন, "না, বরু থাকতে থাকতেই তোকে যেতে হবে। তুই যা হাবা-গোবা; ওর মতো চটপটে ছেলে তোকে যদি নিজের হাতে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে না দেয়, তুই পারবি না।"

কিন্তু পারেননি কী? মিস্টার সমীরণ চ্যাটার্জী নিজেকে জিজ্ঞাসা

করলেন। বরিষণদা যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তা হলে প্রায় পঁচাত্তর বছর বয়স হতো তাঁর। পঁচাত্তর বছরের কত লোকই তো পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছে ;- অথচ বরিষণদা তিরিশ বছরটাও দেখে যেতে পারলেন না।

বরিষণদা লণ্ডনে ওঁকে নিতে এসেছিলেন। জার্মানী থেকে ছুটি নিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন, "দুশ্চিন্তা করবেন বলে মাকে লিখিনি। আমি স্কলারশিপের টাকার উপর ভরসা করি না। আমি ওখানকার একটা কলেজে পড়িয়ে কিছু পাই।"

"মানে ?" সমীরণ জিজ্ঞাসা করেছিল।

"মানে তোকে বলছি। তুই যেন আবার মাকে জানিয়ে দিস না—গভর্নমেণ্ট আমার স্কলারশিপের টাকাটা বন্ধ করে দিয়েছে।"

"কেন ?" সমীরণ আঁতকে উঠেছিল।

"ও কিছু নয়। বার্লিনে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য একটা সোসাইটি আছে। সেখানে দু'একবার যাতায়াত করি, সেই খবরটা কেমন করে হয়তো ওদের কানে পৌঁছে গিয়েছে। তবে ছাখ্, ওতে হয়তো আমার শাপে বর হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারিটা পেয়ে গেলাম।"

"বরিষণদা, তুমি মাস্টার! সায়েবরা তোমার কাছে পড়ে!" গোবরডাঙার সমীরণ অবাক হয়ে গিয়েছিল।

"পড়ে বৈকি। কেন পড়বে না ?"

"পড়া না পারলে সায়েবদের তুমি বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারো বরিষণদা ?"

সমীরণের ছেলেমানুষী দেখে বরিষণ চ্যাটার্জী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ওর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, "ইচ্ছে করলেই পারি। তবে কিনা, পড়া না পারলে এদেশে কান-মলা বা বেঞ্চিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার রীতি নেই।"

খবরটা শুনে সমীরণের খুব আনন্দ হয়েছিল। বলেছিল "তাই বুঝি?"

তখন বরিষণদা বলেছিলেন, "দেখিস, তা বলে যেন পড়াতে ফাঁকি দিস না। আমরা ভারতবর্ষ থেকে এসেছি। এদেশের অনেকেই আমাদের মানুষ বলে মনে করে না। ওদের বোঝাতে হবে পরাধীন দেশের সন্তান হলেও আমরা কোন অংশে ওদের থেকে কম যাই না।"

বরিষণদা তারপর মা-এর লেখা চিঠিটা পড়ে শুনিয়েছিলেন। পড়া শেষ হলে, হাসতে হাসতে চিঠিটা পকেটে রেখে বলেছিলেন, "তোর সম্বন্ধে মার খুব চিন্তা। মা ভাবছেন, কেউ যদি তোকে না ছাখে, তুই রাস্তা দিয়ে হাঁটতেও পারবি না।"

এতোদিন পরে মিস্টার সমীরণ চ্যাটার্জীর মনে হলো, কথাটা কিছু মিথ্যা নয়। পৃথিবীর অপরিচিত পথে নির্ভয়ে একা হাঁটবার মতো ক্ষমতা বোধ হয় কোনোদিনই তাঁর ছিল না। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অন্য লোক এসে বারবার তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত ভীরু হাতদুটি না ধরলে, এতগুলো বছর কাটিয়ে সমীরণ চ্যাটার্জীকে আজ এই হিমালয়ের বুকে এসে বসতে হতো না। প্রথমে মা, তারপর দাদা তাঁর হাত ধরেছিলেন। যদি চিরদিন সেই ভাবেই চলে যেতো মন্দো হতো না। কিন্তু সমীরণ চ্যাটার্জীর সুদীর্ঘ জীবন-নাট্য তাহলে তো দ্বিতীয় অঙ্কেই শেষ হয়ে যেতো।

সমীরণ চ্যাটার্জী আপন মনেই লেখা পড়া করে যাচ্ছিলেন। এখান থেকে হাতের কাজ শিখে ফিরে গিয়ে দেশের দুঃখ দূর করতে হবে। ভালো ছাত্রের জীবনে লেখাপড়া ছাড়া আর কোনকিছুরই তো প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু একটি মুখ নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে কেমন করে যেন সমীরণ চ্যাটার্জীর হৃদয়ের অন্দরমহলে প্রবেশ করেছিল।

এক দুই তিন

সেদিনকার সমীরণ চ্যাটার্জীর কথা ভাবলে আজও অবাক হয়ে যেতে হয়। গোবরডাঙার ছেলে, বিলিতী আদব-কায়দার কিছুই জানতেন না। প্যাণ্ট, কোট, টাই সামলে সায়েবদের সঙ্গে কোনোরকমে তাল রেখে চলতে গিয়েই হাঁপিয়ে উঠতেন। সভ্য হবার জন্য ওদের যে কতরকমের বিদঘুটে আইন আছে তা ভেবে অবাক হয়ে যেতেন। ঐ বৃহৎ ভদ্রতা-কোষের অর্ধেকও সারাজীবনের চেষ্টাতে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

'আয়ত্ত করবার দরকারই বা কী?' সমীরণ চ্যাটার্জী ভাবতেন। 'ক'টা দিন কোনরকমে এই বেয়াড়া দেশে কাটিয়ে গোবরডাঙায় ফিরে যেতে পারলেই হলো। আমি তো আর দাদার মতো বিদেশজোড়া খ্যাতি নিয়ে ইংরেজ ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে যাচ্ছি না।'

হয়তো তাই। হয়তো কোনো ইংরেজকে না জানিয়েই একটা লাজুক 'হোম-সিক' সমীরণ চ্যাটার্জী চুপি-চুপি দেশে ফিরে আসতে পারতো। বৃদ্ধ সমীরণ চ্যাটার্জীর নাতি-নাতনীরা ছাড়া সে ঘটনা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না। কিন্তু কয়েক টুকরো ডিমের খোলা—হ্যাঁ, তিনটে সেদ্ধ-ডিমের ভাঙা খোলাই—একটা মুখচোরা গ্রাম্য ছোকরার জীবনের গতিপথ একদম পাল্টিয়ে দিল। এতোদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। তারপরও পৃথিবীতে কত কোটি কোটি ডিমের খোলা প্রতিদিনই তো সৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু সেই তিনটে ডিমের খোলার কথা তো কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না।

কিন্তু মিস্টার চ্যাটার্জী ভুল করেছিলেন। নিশ্চয় ভুল করেছিলেন। একটুকরো ছোট্ট শিলাখণ্ডের উপর বসে আজকের মিস্টার সমীরণ চ্যাটার্জী ভাবলেন, হয় না, হয় না—তেলে জলে কিছুতেই মিল খায় না।

তিন বন্ধুতে মিলে ওঁরা সহরের বাইরে একটা ছোট্ট গ্রাম্য নদীর ধারে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন। তিনজনই ভারতীয়। কেননা,

ইংরেজদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই সমীরণ চ্যাটার্জীর পেটটা যেন ফুলে উঠতো। ইংরিজী ভাষার অনর্গল যোগান দিতে গিয়ে শরীরটা ওই দারুণ শীতেও ঘেমে উঠতো।

নদীর ধারে নয়নাভিরাম সবুজ ঘাসে-ঢাকা ঐ ছোট্ট নির্জন জায়গাটুকু অনেকেরই প্রিয় পিকনিক-স্পট। ঘাসের উপর বসে ব্যাগের ভিতর থেকে খাবার বার করে ওঁরা খেয়েছিলেন। ডিমের খোসা ছাড়িয়ে খেতে খেতে আড্ডা দেওয়া হয়েছে। তারপর বন্ধু দুজনে বলেছে, 'চলো, গ্রামের ভিতর আমাদের একজন বন্ধু আছে, দেখা করে আসি।'

সমীরণ চ্যাটার্জী যাননি। নদীর ধারে চুপচাপ বসে বসে গোবর-ডাঙাতে ওঁদের যে যমুনা নদী ছিল, তার কথা ভাবতে বেশ লাগছিল। তারপর অনেকক্ষণ ঐভাবে বসে থেকে সমীরণ চ্যাটার্জী কখন উঠে পড়েছিলেন। নিজের মনে স্টেশনের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ খেয়াল হলো রুমালটা নদীর ধারে ঘাসের উপর ফেলে এসেছেন। ফিরে আসতে হলো।

কিন্তু ফিরে এসেই সমীরণ চ্যাটার্জী অবাক হয়ে গেলেন। ওদের ফেলে-রাখা ডিমের এবং কলার খোলাগুলো একটি মেয়ে যত্ন করে মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে তুলে একটা কাগজে রাখছে। ও-ই যে এলিজাবেথ, তা মিস্টার চ্যাটার্জী তখন জানবেন কী করে? কতই বা বয়স? কুড়ি কিম্বা একুশ। প্রায় ওঁরই বয়সী। ওরাও পিকনিক করতে এসেছিল। সমীরণ চ্যাটার্জী তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি। ইণ্ডিয়াতেও তো ওঁরা চড়ুইভাতি করেছেন। সেখানে সবাই তো মাটির হাঁড়ি, ভাঙা উনুন, এঁটো কলাপাতা গাছের তলায় কিংবা মাঠের উপর ফেলে রেখে যায়।

প্রথমে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন সমীরণ চ্যাটার্জী। তারপর সাহস সঞ্চয় করে একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "একি করছেন আপনি?"

"ময়লাগুলো কুড়িয়ে কোথাও একটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে যাবো। না হলে, কাল যারা এখানে পিকনিক করতে আসবে, তারা কী বলবে? স্নিগ্ধ হাসিতে মেয়েটির মুখ ভরে উঠলো।

সমীরণ চ্যাটার্জী ওর মুখের দিকে তাকালেন। যৌবনবতী বিদেশিনী লাবণ্যের রসে টলমল করছে। দীর্ঘ পূর্ণায়ত দেহ। সোনার অঙ্গে নারীত্ব ছাড়া যেন কিছুই নেই।

সমীরণ চ্যাটার্জী এতোক্ষণে যেন নিজের দোষটা বুঝতে পারলেন। সত্যি তো, এতো লোক এখানে আসে, নাচে, গান গায়, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ খায়, অথচ একটা ডিমের খোলাও তো কেউ ফেলে যায় না। এরা আমাদের সম্বন্ধে কী ভাবছে! লজ্জায় সমীরণ চ্যাটার্জীর যেন মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করলো।

কিন্তু এলিজাবেথ? সে কিছুই বললে না। ওর যে মানিয়ে নেওয়ারই স্বভাব। বুঝতে-পারা টলটলে চোখ মেলে সে হেসে বললে, "এতে লজ্জা পাবার কী আছে? এমন ভুল তো আমিও করতে পারতাম, তাহলে আপনি কি..."

গোবরডাঙার ছেলে সমীরণ চ্যাটার্জীর মন তখনও সরল, তখনও সে কেতাদুরস্ত হয়নি। তাই সোজাসুজি স্বীকার করে বললে, "দেখুন, ডিমের খোলা তুলতে আমি ভুলিনি। আসলে ওগুলো যে জড়ো করে কোনো ডাস্টবিনে ফেলা দরকার তা আমি জানতাম না।"

"মিস্টার চ্যাটার্জী, আমি তো আর পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট নই যে আইন না জানার জন্য আপনাকে শাস্তি দেবো!" ডিমের খোলাগুলো কাগজে মুড়তে মুড়তে মেয়েটি বললে।

"আপনি আমার নাম জানেন! আমাকে চেনেন আপনি!" সমীরণ চ্যাটার্জী যেন চমকে উঠলেন।

সোজা উত্তর না দিয়ে মেয়েটি প্রশ্ন করলো, "রিচার্ড স্টোরকে চেনেন আপনি? আপনাদের সঙ্গে পড়ে।"

"চিনি বইকি, খুব চিনি।"

"রিচার্ডের কাছেই আপনাদের কয়েকজনের একটা ফটো দেখেছি। আমি এলিজাবেথ, রিচার্ডের ছোটো বোন।"

সমীরণ চ্যাটার্জী যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কিন্তু গোবর-ডাঙার সরলতা তখনও তো যায়নি। তাই ভয়ে ভয়ে এলিজাবেথকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রিচার্ডকে এই-সব কথা আপনি বলবেন তো ?"

"পাগল হয়েছেন, মিস্টার চ্যাটার্জী ? অপরের সম্বন্ধে লাগিয়ে বেড়ানো আমার স্বভাব নয়।" এলিজাবেথ এবার যেন একটু অভিমান করে বসলো। বললে, "আমার বলে নিজের পড়াশুনা করতে করতেই কোথা দিয়ে দিন কেটে যায় বুঝতে পারি না, আর আমি কিনা দাদার কাছে আপনার বিরুদ্ধে লাগাতে যাচ্ছি। আচ্ছা, আমাকে দেখলে বুঝি ঝগড়াটি মনে হয় ?"

ক্ষমা চাইতে গিয়ে মুশকিলে পড়ে গেলেন সমীরণ চ্যাটার্জী। ভেবেচিন্তে বললেন, "আপনার অতিবড়ো শত্রুও সে-কথা বলতে পারবে না। আপনাকে দেখলে সরলতার প্রতিমূর্তি মনে হয়। ঠিক আমাদের গডেস্ সরস্বতীর মতন।"

"সত্যি ?" এলিজাবেথ যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল। "সরস্বতী কে ?" ছোট্ট মেয়ের মতো এলিজাবেথ প্রশ্ন করেছিল।

"গডেস্ অব্ লার্নিং। আমাদের বিদ্যার দেবী।"

"লার্নিং !" এলিজাবেথ বেজায় খুশী হয়ে উঠেছিল। "সুন্দর তো। অথচ আমার দাদা রিচার্ড কি বলে জানো ? বলে, শুধু-শুধুই আমি কলেজে ভর্তি হয়েছি। আমার নাকি লেখাপড়া হবে না।"

এ-সব কতদিন আগেকার কথা। কিন্তু সমীরণ চ্যাটার্জী আজও সব মনে রেখে দিয়েছেন।

আপন খেয়ালে ওয়াকিং-স্টিকটা অকারণে পাথরের উপর ঠুকতে ঠুকতে নিজের স্মৃতিশক্তিতে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন মিস্টার

চ্যাটার্জী। ভাবলেন, মনের ধর্মই বোধহয় এই। মন যা চায় স্মরণের সমুদ্রে তা সহজেই ভেসে থাকে, যা চায় না তা সকলের অজ্ঞাতে বিস্মৃতির অতল গর্ভে চিরদিনের মতো হারিয়ে যায়।

তার পর আরও কতদিনই তো এলিজাবেথকে দেখেছেন তিনি। কিন্তু যৌবনের সেই পাগল-করা দিনগুলো আজও ওঁর চোখের সামনে নিয়ন-আলোর মতো জ্বলছে আর নিভছে।

সেদিন বাড়ি ফিরে এসে সমীরণ চ্যাটার্জী ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন মনে হয়েছিল, উনি কারুরই উপর সুবিচার করছেন না। টেবিলের সামনেই দাদার চিঠিটা পড়েছিল।

লিখেছিলেন, "স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিস। রোজ একটু দুধ খাস। টাকার জন্য চিন্তা করিস না, আমি তো রয়েছি। তুই শুধু মন দিয়ে পড়াশোনা করে যা।"

ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন সমীরণ চ্যাটার্জী। এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা হলেও কথা বলতে ভয় পেয়েছেন। কয়েকটা টাকার জন্য আমার দাদা জার্মানিতে দিনরাত খেটে মরছেন, আমার মা গোবরডাঙার একটা অন্ধকার বাড়িতে আমার চিঠির আশায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছেন, আর আমি কী করছি?

নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন সমীরণ চ্যাটার্জী। সোনার স্বপ্নের মতো রঙীন একটি মেয়েকে মন থেকে ঝেড়ে-মুছে ফেলতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু তবুও সংসার বোধহয় তাঁকে ক্ষমা করলো না। মাথা পেতে শাস্তি গ্রহণ করতে হলো তাঁকে।

মিস্টার চ্যাটার্জী চোখের সামনে সেই দিনটা দেখতে পাচ্ছেন। যেদিন খবর এল বরিষণ চ্যাটার্জী আর ইহলোকে নেই। ল্যাবরেটরিতে গবেষণার সময় বিস্ফোরণ হয়, সেই বিস্ফোরণে বাড়িটার অর্ধেকটা এবং সেই সঙ্গে বরিষণ চ্যাটার্জীর দেহটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। খবর পেয়েই সমীরণ চ্যাটার্জী বার্লিনে ছুটে গিয়েছিলেন।

রাইনের জলে বরিষণদার জামাজুতোগুলো ভাসিয়ে দিয়ে খালি-পায়ে যেদিন তিনি নদী থেকে উঠে এসেছিলেন সেদিনটাও মনে পড়ছে। আরও বেশী করে মনে পড়ছে এইজন্যে যে, সেদিনই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন দাদা বেশ কিছু টাকা দেনা রেখে গিয়েছেন। দেশের এবং ছোট ভাই-এর খরচ চালাতে না পেরে মাসে মাসে কিছু টাকা ধার করতে হয়েছিল, ভেবেছিলেন সামনের বছরে পদোন্নতি হলে টাকাটা সহজেই শোধ করে দিতে পারবেন।

যে ভদ্রমহিলা বরিষণদাকে টাকা ধার দিতেন, সমীরণ চ্যাটার্জী তাঁর সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। ওঁকে দেখে ভদ্রমহিলা কাঁদতে আরম্ভ করেছিলেন। চোখদুটো রুমালে মুছতে মুছতে বলেছিলেন, "না না, আমি টাকার জন্য কাঁদছি না। আমরা একটা মানুষ হারালাম। অমন মানুষ পৃথিবীর কোথাও আজকাল বেশী জন্মাচ্ছে না।"

"আপনি চিন্তা করবেন না, আমি সব টাকা শোধ করে দেবো।" সমীরণ সেদিন বলেছিলেন। "তবে আমাকে একটু সময় দিতে হবে। প্লিজ্।"

বার্মিংহামে ফিরে এসে কলেজে-পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন সমীরণ চ্যাটার্জী।

সেদিনটাও বেশ মনে আছে। পড়া ছেড়ে দিতে খুবই কষ্ট হয়েছিল। ঘরে বসে বসে একমনে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন সমীরণ চ্যাটার্জী। কিন্তু উপায় ছিল না। পড়া ছেড়ে চাকরিতে না ঢুকলে এই বিদেশে কে তাঁকে দেখবে, কে তাঁর দাদার দেনা শোধ করবে?

কাউকে খবর না দিয়েই সমীরণ চ্যাটার্জী কলেজের হোস্টেল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কারখানায় কাজ করে প্রায়-বস্তির-মতো একটা বাড়িতে কোনোরকমে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলেন।

একটা ঘরে দুজনে থাকা। আর বস্তির লোকদের যা কদর্য অভ্যাস। ওদের না আছে চরিত্র, না আছে রুচি। এমন কুৎসিত

ভাষায় কথা বলে যে সব সময় কানে আঙুল দিয়ে থাকতে হতো।
বিকৃত জীবন বোধের নমুনা পেয়ে বমি আসতো। কিন্তু উপায় কী?

খালি-গায়ে সমীরণ চ্যাটর্জীকে দেখে রুম-মেট হেসে ফেলতো।
বলতো, "চ্যাটার্জী, তোমার গলায় দড়ির মতো ওটা কী?"

"পৈতে। হিন্দু ব্রাহমিন-এর সেক্রেড থ্রেড্।" সমীরণ উত্তর
দিয়েছিলেন।

"ওই লাইনটার মধ্য দিয়ে অল মাইটি গডের কাছে তোমরা
মেসেজ পাঠাও বুঝি? হাউ ফানি!"

এইখানেই রসিকতা শেষ হয়নি। লোকটা বলেছে, "হাই
ভোল্টেজের ইলেকট্রিক তার ঐভাবে খোলা অবস্থায় রেখে
দিয়েছো! দেখি, ছুঁলে শক্ লাগে কিনা।"

কী বলবেন সমীরণ চ্যাটার্জী? মুখ বুজে সব সহ্য করতে
হয়েছে। এক এক বার ইচ্ছে হয়েছে, সব ফেলে দিয়ে দেশে ফিরে
যান। কিন্তু সেখানে ফিরে গিয়েই বা করবেন কী।

কিন্তু তবুও হয়তো সমীরণ চ্যাটার্জী ফিরে যেতেন, যদি না
এলিজাবেথ ওঁকে সান্ত্বনা দিত, উৎসাহ দিত।

কোথা থেকে ঠিকানা যোগাড় করে এলিজাবেথ ওঁকে খুঁজে
বার করেছিল। দেখা হলে বলেছিল, "বাঃ, বেশ লোক তো,
পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো হচ্ছে!"

সমীরণ চ্যাটার্জী তখন ওঁর অনভ্যস্ত ইংরিজীতে নিজের সব কথা
খুলে বলেছিলেন। বলেছিলেন, "এলিজাবেথ, তোমার রূপ আছে,
বংশগৌরব আছে। আমার মতো হতভাগার জন্য নিজেকে তুমি নষ্ট
কোরো না।"

"টাকা আর প্রতিপত্তির জন্য বুঝি মানুষ মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব
পাতায়?" এলিজাবেথ প্রশ্ন করেছিল।

"কিন্তু আমি ইণ্ডিয়ান। সামান্য নেটিভ। তোমার দাদা, তোমার
বাবা-মা—তাঁদের কথা একটু ভেবে দেখো।" সমীরণ বলেছিলেন।

"ঐটুকু স্বাধীনতা এই দেশের মাটিতে সাবালিকা হয়ে আমরা সবাই ভোগ করি।" এলিজাবেথ গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছিল।

কিন্তু কেবল বন্ধুত্ব। ওর বেশী তখনও সমীরণ চ্যাটার্জী ভাবতে পারেন নি। বিদেশে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এক হৃদয়ময়ী মহিলার সংস্পর্শে জীবনের তিক্ততা অনেকটা কেটে গিয়েছিল, এই পর্যন্ত। কিন্তু অবুজ মনটা তখনও পড়ে ছিল সমুদ্রের ওপারে ভারতবর্ষে।

সমীরণ চ্যাটার্জী ভেবেছিলেন, একদিকে ওঁর ভাগ্যটা ভালো। ওঁর মায়ের ভাষায়, একলা রাস্তা পেরোতে পারেন না বটে ; কিন্তু হাত ধরে রাস্তা পার করে দেওয়ার লোকেরও অভাব হয় না। যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই কোথা থেকে কেউ ওঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সাহস দিয়েছে, পরামর্শ দিয়েছে, এমন কি হাত ধরে রাস্তা পার করে দিয়েছে।

এলিজাবেথ সম্বন্ধেও এতো বেশী ভাবতে হতো না। কিন্তু ওই সর্বনাশা রোগটা। তাতেই সব গোলমাল হয়ে গেল।

ব্যায়াম করে তৈরি সমীরণ চ্যাটার্জীর শক্ত দেহটার মধ্যেও ইংলণ্ডে ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়া প্লুরিসি ঢুকিয়ে দিল। এক মাস হাসপাতালে পড়ে ছিলেন সমীরণ চ্যাটার্জী। তখন এলিজাবেথ না থাকলে কী হতো? প্রতিদিন সে হাসপাতালে এসেছে। জিজ্ঞাসা করেছে, 'কেমন আছ?'

অবাক হয়ে গিয়েছেন সমীরণ চ্যাটার্জী। ফল কিনে এনেছে এলিজাবেথ। কানে কানে জিজ্ঞাসা করেছে, টাকার দরকার আছে কিনা। বলেছে, "সমীর, তুমি একটুও দ্বিধা বোধ কোরো না, এ আমার নিজের রোজগার করা টাকা। আমি যে এখন চাকরি করছি।"

কেঁদে ফেলেছেন সমীরণ চ্যাটার্জী। পৃথিবীর সবাই যদি এমন হতো, তা হলে পৃথিবীটা আরও কত সুন্দর হতো।

কিন্তু তখনও এলিজাবেথের সহৃদয়তাকে করুণা ব'লেই ধরে

নিয়েছিলেন সমীরণ চ্যাটার্জী। ভেবে পাচ্ছিলেন না, কেমন করে এসব শোধ দেবেন তিনি।

কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরোবার পরেই সমস্যাটা যেন আরও পাকিয়ে উঠলো।

এলিজাবেথ বলেছে, "তোমাকে ঐ বস্তিতে আমি কিছুতেই থাকতে দেবো না। কারখানার ঐ লোহা-পেটা কাজও আর করতে পাবে না। ডাক্তার বলে দিয়েছে, বেশ কিছুদিন সাবধানে না থাকলে, এবার যে কোন খারাপ রোগ ধরতে পারে।"

কিন্তু ও-সব তো বলাই সহজ। এলিজাবেথের মতো সংসারী মেয়েরা যে তা জানে না, এমন নয়। ওর ইচ্ছে ছিল, সমীরণকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়, নিজেদেরই সঙ্গে রাখে। কিন্তু দাদা, মা এদের মনের কথা তো সে জানে। বাড়িতে নেটিভ রাখা!

একটুকরো পাথরের উপর লাঠি-হাতে ব'সে, সমীরণ চ্যাটার্জী বেদনার্ত ভাবে হাসলেন। 'বেচারা! ভুল করেছিল ওরা। মনের ভাব মনে চেপে রেখে তখন যদি লোকটাকে ওরা সপ্তাহখানেক বাড়িতে আশ্রয় দিত, তা হলে মেয়েটাকে হারাতে হতো না। ওরা তখনও বোঝেনি মেয়েটা কতদূর এগোতে পারে।'

গম্ভীরভাবে এলিজাবেথ বলেছিল, "এখন একটা মাত্র উপায় আছে, সমীর। আমরা সেইপথেই এগিয়ে যাবো—বিয়ে করে আমরা আলাদা বাসা করবো। না হলে তোমাকে বাঁচাতে পারবো না।"

"বিয়ে?" সমীরণ চ্যাটার্জী যেন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এ-সব নিয়ে মা হয়তো চিন্তা করেন, কিন্তু তিনি তো কোনোদিন করেননি। তাও আবার এলিজাবেথকে বিয়ে। মাটির সমীরণ চ্যাটার্জীর কাছে সে তো আকাশের পরী! দুয়োরানীর ছেলের দুঃখে স্বর্গের পরীর মায়া হয়েছে।

ভাববার অবসর ছিল না তখন। বাঁচবার প্রশ্নটা, দাদার দেনা-

শোধের প্রশ্নটাই তখন অনেক বড়ো। তবু সমীরণ চ্যাটার্জী বলেছিলেন, "ভেবে দেখেছো? খুব ভালো করে ভেবে দেখেছো এলিজাবেথ? করুণা করে…"

"হোয়াট? আই লাভ ইউ…সমীর, আমি তোমাকে ভালবাসি…ডোণ্ট ইউ? তুমি, আমাকে ভালবাস না?"

চোখের জল ফেলে সমীরণ চ্যাটার্জী সেদিন উত্তর দিয়েছিলেন। এলিজাবেজ, এলিজাবেথ কি তাঁর আজকের; সে যে তাঁর অনেক, অনেক জন্মের সহধর্মিণী।

"হোয়াট? এলিজাবেথ স্টোরের বাবা, মা, দাদা একসঙ্গে চীৎকার করে উঠেছিলেন। "ইণ্ডিয়ান! বার্মিংহামের ঝি, ধোপানী, রাধুনীরা পর্যন্ত যে-দেশের ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র ব্যারিস্টারদের সহজে বিয়ে করতে চায় না।"

কিন্তু কোনো বাধাই খাটলো না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেই এলিজাবেথ ওঁকে বিয়ে করলো।

রূপকথার গল্পের মতো এইখানেই যদি কাহিনীর শেষ হতো, কেমন সুন্দর হতো। "তারপর ঘুঁটেকুড়ুনির ছেলে বিদেশিনী রাজকন্যার সঙ্গে সুখে সংসার করিতে লাগিল,"—এই বলে সমীরণ চ্যাটার্জী যদি নিজের গল্পটা শেষ করতে পারতেন, তা হলে তো কথাই থাকতো না।

স্মৃতির টেপ-রেকর্ডে জীবনের এইটুকু অক্ষত রেখে, সমীরণ চ্যাটার্জী যদি আর সবটুকু মুছে ফেলতে পারতেন, তাহলেও বেশ হতো। কিন্তু তাও বা হলো কই?

কিন্তু সমীরণ চ্যাটার্জীরও কি কোনো দোষ ছিল না? এতে পেয়েও তো দেশের কথা ভুলতে পারলেন না তিনি। কী করবে তিনি? ভোলা যে যায় না। ভোলার যে কোনো উপায় থাকে না

"ওঁকে, ওঁকে জিজ্ঞাসা করো না।"

চিন্তায় যেন বাধা পড়লো। হঠাৎ যেন নারীকণ্ঠ শুনতে পেলেন মিস্টার সমীরণ চ্যাটার্জী।

আত্মচিন্তায় ডুবে থেকে কখন যে সূর্য অস্ত গিয়েছে তাও খেয়াল করেননি তিনি। এখনই কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘন অন্ধকার এসে সবকিছু গ্রাস করবে। এই পাহাড়ের মজাই এই। এখানে সব-কিছুই হঠাৎ হয়। আঁধার-মহিষকে দু'খানা করে কেটে হঠাৎ সূর্যের উদয় হয়; হঠাৎ নির্মল আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যায়; হঠাৎ প্রবল বর্ষণ শুরু হয়; আবার মৃত্যুপথযাত্রী সূর্য হঠাৎ-ই মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পাহাড়, গাছ, বাড়ি-ঘরদোর শেষবারের মতো রাঙিয়ে তোলে।

কিন্তু এমন সময় যে বাংলা ভাষা শুনতে পাবেন সমীরণ চ্যাটার্জী আশা করেননি। শুনতে পেলেন মেয়েটি বলছে, "ওঁকেই জিজ্ঞাসা করো।"

মেয়েটির সঙ্গে পাঞ্জাবি ও চাদর-পরা একটি ছোকরা-পুরুষ রয়েছেন। এবার সঙ্কোচ কাটিয়ে এগিয়ে এসে তিনি বললেন, "এক্সকিউজ মি।"

হেসে ফেললেন মিস্টার চ্যাটার্জী। এতোদিন বিলেতে থাকা তাহলে সার্থক হয়েছে! ওঁর গায়ের রঙ সত্বেও, বাঙালী বলে বুঝতে পারে নি।

ভদ্রলোক এবার বললেন, "Is there any hotel nearby?"

"হোটেল? আপনারা ডাকবাংলোতে চেষ্টা করেননি?"

ওঁর মুখে বাংলা কথা শুনে সেই অন্ধকারেও যে মেয়েটির মুখে ভরসার ছাপ ফুটে উঠলো, মিস্টার চ্যাটার্জী তা বেশ বুঝতে পারলেন।

ভদ্রলোক বললেন, "ডাকবাংলোতে জায়গা নেই। বিনা নোটিশে ভি-আই-পি এসে পড়েছেন।"

"একটা হোটেল আছে। এখান থেকে দেড়মাইল দূরে। কিন্তু সেখানে গিয়েও জায়গা পাবেন মনে হয় না।" মিস্টার চ্যাটার্জী দেখলেন, ওদের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো।

"কিছু যদি না মনে করেন, তবে আমার ওখানেই চলুন না ?"

ছোকরা এবার মহিলাটির দিকে তাকালেন। দুজনে যেন আলোচনা করতে চাইছেন। মিস্টার চ্যাটার্জী বললেন, "আমি না হয় একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, আপনারা আলোচনা করে ঠিক করে নিন।"

মেয়েটি এবার মুখ খুললো। "না, না, আলোচনা করবার কিছু নেই। আপনার সঙ্গে দেখা না হলে কী যে হতো!"

"কী আর হতো", ভদ্রলোক বললেন। "হয়তো বাঘ বেরিয়ে আসতো, এবং 'লেডীজ ফার্স্ট' বলে তোমাকে দিয়েই শুরু করতো।"

"করলেই হলো! মেয়েদের মাংস কোনো ভদ্রলোক বাঘ পছন্দ করতে পারে না।" মেয়েটি উত্তর দিল।

ওদের কথাবার্তায় মিঃ চ্যাটার্জীও যেন হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বেশ প্রাণ আছে তো ওদের মধ্যে। যৌবনের ধর্মই বোধহয় ওই। যা-কিছু স্পর্শ করে, তাতেই নবীন প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠে। এলিজাবেথ ও তিনি যখন বেড়াতে বেরোতেন, তখনও এমন হয়েছে।

ছেলেটির নাম প্রশান্ত। বাড়িতে ঢোকবার আগেই যেন কেমন আপন হয়ে উঠলো। বললে, "আমার কোনো দোষ নেই। দেখুন না, বাসে করে আমরা রানীক্ষেত যাচ্ছিলাম, বাস্‌টা এইখানে কিছুক্ষণ থেমেছিল। অস্তমিত সূর্যের শোভা দেখে হিমানীর এমন ভালো লেগে গেল যে, এখানেই নেমে পড়তে চাইল। বলুন তো, এমন খেয়ালের কোনো মানে হয় ?"

অল্পবয়সের বৌ। কেমন যেন ওঁর উপরেই নির্ভর করে অসহায় হিমানী বললে, "দেখছেন তো। না হয় একটা ভুলই করে ফেলেছি, কিন্তু তার জন্য কিরকম গঞ্জনা দিচ্ছে। অথচ জানেন, আপনার কাছে গিয়ে কথা বলতেই সাহস করছিল না। আমি দেখলাম আপনি চুপচাপ পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন! আমিই তো

বললাম, ওঁকে জিজ্ঞাসা করো, হাজার হোক উনিও তো মানুষ। বড়োজোর রেগে যাবেন, কিন্তু তোমাকে খেয়ে ফেলবেন না।”

হাঁটতে হাঁটতে শেষপর্যন্ত ওঁরা গোল্ডেন-ভিউ-এর সামনে এসে পড়লেন। সমীরণ চ্যাটার্জী বললেন, “আসুন।”

ড্রইংরুমের ভিতরে ওদের বসতে বললেন মিস্টার চ্যাটার্জী।

“এই সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ এসে আমরা আপনাকে কিন্তু বেশ অসুবিধায় ফেললাম।”

মিস্টার চ্যাটার্জী হেসে ফেললেন। “তাই নাকি? সারা জীবন সুবিধে পেয়ে পেয়ে ঐ জিনিসটাতে অরুচি ধরে গিয়েছে, এখন না হয় একটু অসুবিধে ভোগ করা গেল।”

একটু থামলেন মিস্টার চ্যাটার্জী। তারপর বললেন, “এ-বাড়িতে আপনাদের অভ্যর্থনার জন্য গৃহিণী কেউ নেই। হয়তো আপনাদের অসুবিধা হবে। তবে হিমালয় সিং ওর যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।”

হিমানী গুরুজনের সামনে স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবশতঃ ঘোমটা টেনে দিয়েছিল। তবুও ওরই মধ্যে ঘরটার চারিদিক বোধহয় খুঁটিয়ে দেখছিল।

মিস্টার চ্যাটার্জীর নজরে পড়তেই বললেন, “এ-বাড়িতে একটা শোবার ঘর সব সময়েই খালি পড়ে থাকে, সুতরাং তোমাদের সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই। ভাড়া নেবার পর থেকেই হিমালয় সিং ঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে, যদি কোনোদিন আমার কোনো আত্মীয়স্বজন আসে।”

মনে মনে মিস্টার চ্যাটার্জী ভাবলেন, কে-ই বা তাঁর আছে। কে এসে সমীরণ চ্যাটার্জীর বাড়িতে উঠবে? কিন্তু খালি ঘরটা আজ কাজে লেগে গেল।

খাবার টেবিলে মিস্টার চ্যাটার্জী লজ্জিত হয়ে বললেন, “দেশী কায়দায় আপনাদের অভ্যর্থনা করতে পারলাম না। ও-সবের কিছুই আমার যোগাড় নেই।”

অনেক দিন পরে ডিনার টেবিলে মিস্টার চ্যাটার্জী যেন কথাবার্তা শুনলেন। এলিজাবেথ বলতো। খেতে খেতে সুখদুঃখের কত কথাই হতো। ব্যবসার চিন্তায় গম্ভীরভাবে বসে থাকলেও এলিজাবেথ ছাড়তো না। বলতো, "কি হয়েছে তোমার? দেশের জন্য মন-কেমন করছে?"

সমীরণ চ্যাটার্জী লজ্জা পেয়ে বলতেন, "কই, না তো।"

এলিজাবেথ কিন্তু আশ্বস্ত হতো না। স্বামীকে কী ভাবে সুখে রাখবে ভেবেই পেতো না। বলতো, "তোমাকে আমি খুব কষ্ট দিচ্ছি, তাই না? নিজের দেশের মেয়ে বিয়ে করলে সে তোমার সুখদুঃখ সমান ভাবে ভাগ করে নিতে পারতো।"

সমীরণ চ্যাটার্জী কানে আঙুল দিয়েছিলেন। "কি বলছো এলিজাবেথ? এই বিদেশে তোমাকে না পেলে, এতোদিনে আমি কোথায় তলিয়ে যেতাম। শুধু তোমারই দয়ায়, তোমারই জন্য আজও মানুষের মতো বেঁচে রয়েছি।"

এলিজাবেথ বলেছিল, "আচ্ছা, তোমার মাকেও এখানে নিয়ে এসো না।"

"বিয়ের পরও মাকে যারা নিজেদের সংসারে রাখে ইংলণ্ডের সমাজ তাদের তো ভালোর চোখে দেখে না।" সমীরণ চ্যাটার্জী ব্যঙ্গ মিশ্রিত কণ্ঠে বলেছিলেন।

এলিজাবেথ কিন্তু সরলপ্রাণেই উত্তর দিয়েছিল, "আমি তো আর ইংরেজ-ঘরের বৌ নই। আমি আমার স্বামীর দেশের নিয়ম-মতে চলবো। তাতে কার কী বলবার থাকতে পারে? তুমি ওঁকে চলে আসতে লিখে দাও। আমি খরচা চালিয়ে নেবো।"

সত্যি, সমীরণ চ্যাটার্জীর একবার লোভ হয়েছিল। মন্দ কী কিন্তু মা? মা যে কিছুতেই আসবেন না, তা তিনি জানতেন এলিজাবেথকে বলেছিলেন, "হিন্দুঘরের বিধবাদের তুমি দেখোনি এলিজাবেথ।"

সে-সব দিন কোথায় হারিয়ে গেল, মিস্টার চ্যাটার্জী ভাবলেন। তাঁর ভারতীয় অতিথি দেখলে এলিজাবেথ আনন্দে নেচে উঠতো। এদের দুজনকে দেখলে এতোক্ষণ প্রশ্ন করে করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো।

বলতো, "এতো কষ্ট করে যখন এসেছেন, তখন আমাকে দু'একটা বেঙ্গলী ডিশের রান্না শিখিয়ে দিয়ে যান। আমারও কপাল দেখুন না, সমীরটা কিচ্ছু জানে না। ইণ্ডিয়াতে থাকবার সময় ভুল করেও বোধহয় একবার কিচেনে ঢোকেনি।"

অতিথিরা হয়তো চুপ করে থাকতেন। এলিজাবেথ তখন বলতো, "জানেন, ঐটাই আমার দুঃখ। দেশ থেকে চলে আসবার পর আমার স্বামী বোধহয় একদিনও পেট ভরে খাননি। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে খাবার যে রুচি তৈরি হয়ে যায়, সে কি আর বদলায়?"

ইংরেজ মেয়ের স্বামীভক্তি দেখে হিমানী ও প্রশান্ত হয়তো অবাক হয়ে যেতো। ভাবতো, এমনও কি সম্ভব?

এলিজাবেথ ততক্ষণ ভাঙা-ভাঙা বাংলায় বলতো, "আমার··· হোয়াট?" বাংলা কথাটা ওর কিছুতেই মনে থাকতো না। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলতো, "ইয়েস্ ইয়েস্, মাই শাশুড়ী একবার পার্সেল-পোস্টে কি যেন পাঠিয়েছিলেন।"

তারপরই সমীরণের খোঁজ পড়তো। "সমীরণ, ডার্লিং, ওই জিনিসগুলোর কী নাম? আমার ডাইরীতে লেখা আছে।"

সমীরণ মনে করিয়ে দিতেন, "বড়ি।"

"কিসের তৈরি?"

"কলাই-এর ডালে।"

"ইয়েস্ ইয়েস্," এলিজাবেথ যেন এতোক্ষণে সব মনে করতে পারছে।

"ঐগুলো কী ভাবে রাঁধতে হয় তা এখানকার কেউ খবর রাখে না। আমাদের 'নেবার' মিসেস গ্রীণউড ত্রিশবছর ইণ্ডিয়াতে ছিলেন।

"আপনি বুঝি নির্জনতা ভালবাসেন?" হিমানী জিজ্ঞাসা করলো।

মিস্টার চ্যাটার্জী যেন চমকে উঠলেন। মনের মধ্যে হোঁচট খেলেও বাইরে তা প্রকাশ করতে দিলেন না। বললেন, "একটা বয়স থাকে মানুষ যখন দোসর খোঁজে। বহুজনের মধ্যে সে থাকতে চায়। তারপর আবার একটা বয়স আসে, যখন নির্জনতাই ভালো লাগে।"

হিমানী শ্রদ্ধায় মাথা নত করলে। বললে, "নির্জনে থাকাটাই একরকমের সাধনা। আমি বুঝি, ওটা খুব ভালো জিনিস। কিন্তু জানেন, আমি কিছুতেই একলা থাকতে পারিনা। অথচ, বুঝি একলা না থাকলে মনকে উর্ধ্বমুখী করা যায় না।

মিস্টার চ্যাটার্জী ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, সারাদিন ঘুরে ঘুরে ওরা দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শোয়ার ঘরটা ওদের দেখিয়ে দিয়ে মিস্টার চ্যাটার্জী আবার নিজের ঘরে এসে ঢুকলেন। আজ রাত্রে মনটা অপরূপ প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে।'

বিছানায় বসে মনে হলো, ওদের আর একটা কম্বল দেওয়া দরকার। নোতুন জায়গার শীতে ওরা নিশ্চয় অভ্যস্ত নয়। ওঁর বিছানাতে দুটো কম্বল ভাঁজ করা রয়েছে।

একটা কম্বল তুলে নিয়ে মিস্টার চ্যাটার্জী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দরজাটা ওরা ভেজিয়ে দিয়েছে। ঘরেব দরজায় মৃদু টোকা দিলেন মিস্টার চ্যাটার্জী।

প্রশান্ত এসে ভেজানো দরজাটা খুলে দিল। "একি, আপনি আবার কষ্ট করে উঠে এলেন?"

"মনে হলো, বাত্রে তোমাদের শীত লাগবে। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে শীতও বাড়ে।" ঘরের মধ্যে হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোকে মিস্টার চ্যাটার্জী দেখলেন, ঘোমটা দিয়ে হিমানী চেয়ারে একটা বাংলা পূজা-সংখ্যা নিয়ে বসে আছে। চোখে চশমা ছিল

না, তবু যেন পরিতৃপ্ত সংসারের একটা স্বপ্নময় ছবি; মিস্টার চ্যাটার্জী চোখের সামনে দেখতে পেলেন।

"তোমরা ঘুমোও, মা। ঘরের লাগোয়া বাথরুমটা দেখে নিয়েছো তো? রাত্রে কোনোরকম দরকার হলে আমার দরজায় নক্ করতে সঙ্কোচ কোরো না।"

মিস্টার চ্যাটার্জী এবার নিজের ঘরে এসে বসলেন। কেরোসিনের আলোটা খুব কমানো রয়েছে। ইচ্ছে করলেই ইলেকট্রিক নিতে পারেন তিনি। কোশী নদী থেকে বিদ্যুতের লাইন এই দিক দিয়েই গিয়েছে। কিন্তু এই স্বল্পালোকিত পরিবেশই পছন্দ করেন মিস্টার চ্যাটার্জী।

ওঁর প্রিয় জানলাটার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। দূরের উপত্যকা থেকে আরম্ভ করে কাছের দেওদার, ইউক্যালিপ্টাসের ছোকরা গাছগুলো পর্যন্ত নিজেদের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে মিস্টার চ্যাটার্জীর মুখের উপর অন্ধকারের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কিম্বা হয়তো দরজা কেবল ভেজানো আছে। একটু ধৈর্য ধরে অন্ধকারের দ্বারে টোকা দিয়ে, ঐদিকে তাকিয়ে থাকলেই হয়তো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন গাছগুলোর উলঙ্গ দেহ মিস্টার চ্যাটার্জী দেখতে পাবেন।

আজ যেন কিছুতেই ঘুম আসবে বলে মনে হচ্ছে না। ইজি-চেয়ারে এসে বসলেন সমীরণ চ্যাটার্জী। কতরকমের চিন্তা এসে জড়ো হচ্ছে। এতো বছর ধরে স্মৃতির গুদোমখানায় কত অদ্ভুত ঘটনা এসে জমা হয়েছে। ওখানে যেন আর একটুও জায়গা নেই। এক এক সময় ইচ্ছে হয়, মূল্যহীন অপ্রয়োজনীয় সঞ্চয়গুলো ওখান থেকে ঝেঁটিয়ে বার করে দেবেন। শুধু এলিজাবেথকে সেখানে রেখে, আর সব-কিছুই, এমন-কি ওর ছেলেকেও মন থেকে মুছে ফেলে দেবেন।

কিন্তু এলিজাবেথ কি তাতে রাজী হতো? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু

মিস্টার চ্যাটার্জীর অনেকদিন আগেই বোঝা উচিত ছিল, এ হয় না। এ হয় না—ভুল করেছিলেন তিনি।

আঁধারের যদি কোনো রূপ থাকে, তবে নিস্তব্ধতারও একটা রূপ আছে। আজ সারারাত জেগে মিস্টার চ্যাটার্জী সেই রূপ উপভোগ করতেন, যদি না পাশের ঘর থেকে চাপা গলায় ফিসফিস শব্দ ভেসে আসতো। ওরা দুজনে গল্প করছে। নোতুন জায়গাতে এসে সঙ্কোচের সঙ্গে খুব আস্তে আস্তেই কথা বলছে। কিন্তু এই নিস্তব্ধতায় নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও যে শোনা যায়!

ওঁর জীবনেও এমন হতে পারতো। নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে পুত্র ও পুত্রবধূর গলার শব্দ উনিও শুনতে পেতে পারতেন।

এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করেছিল, "তাই বুঝি তোমাদের নিয়ম?"

সমীরণ চ্যাটার্জী বলেছিলেন, "হ্যাঁ। তোমার ছেলে বড় হবে, তুমি তার বিয়ে দেবে; বউ এসে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করবে—আমাদের দেশে তাই তো নিয়ম।"

এলিজাবেথ অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, "বাঃ, বেশ সুন্দর নিয়ম তো। কিন্তু আমার ছেলের বউ-ই যদি সব কাজ করে দেবে, তা হলে আমি কী করবো?" এলিজাবেথ যেন এ প্রশ্নের উত্তরই খুঁজে পাচ্ছিল না।

মিস্টার চ্যাটার্জী বলেছিলেন, "ও-সব নিয়ে চিন্তা কোরো না। তোমার নাতি-নাতনীদের মানুষ করবার জন্যও তো লোক চাই।"

এলিজাবেথ খুশী হয়েছিল। "Yes, that's a good idea."

কিন্তু সে-সব আইডিয়া কোথায় ভেসে গেল!

পাশের ঘর থেকে আর কোনো শব্দ তো ভেসে আসছে না? ওরা কি তাহলে ঘুমিয়ে পড়লো? না, রেগে গিয়ে আড়ি করে বৌমা কথা বন্ধ করে দিয়েছে? আঃ কী সুন্দর। এই আড়ি, আবার এই ভাব।

যা ভেবেছেন তাই। প্রশান্তর কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, বৌমার গলার স্বরও আবার পাওয়া গেল।

সত্যি, আপন ভাষায় কথা বলতে কী আনন্দ! মিস্টার চ্যাটার্জীর আপসোস হলো, যৌবনে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাঁর বধূর সঙ্গে তিনিও ঐ ভাবে কথা বলতে পারতেন। কিন্তু তা হয়নি।

শুয়ে শুয়ে এলিজাবেথের সঙ্গে কথা বলতে তাঁরও ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু তারপরই একটা অস্বস্তিকর অনুভূতিতে মনটা ভরে উঠেছে। গোবরডাঙার সমীরণ ইংলণ্ডের এক অন্ধকার ঘরে শুয়ে রয়েছে। পাশেই শয্যাসঙ্গিনী-গাউন-পরা এক মেম। তাঁর স্ত্রী, তাঁর নিজেরই বিবাহিতা স্ত্রী! কিন্তু বউ বলতে ছোটোবেলায় ঘোমটাপরা, লজ্জাবিধুরা যে মূর্তিটি চোখের সামনে ভেসে উঠতো তা নয়।

সমীরণ চ্যাটার্জী নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন। কী ছেলে-মানুষী করছেন তিনি! গোবরডাঙার মফস্বল মনোবৃত্তি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। নিজে জেনেশুনে বিয়ে করেছেন তিনি। জোর করে মেয়েটাকে তাঁর ঘাড়ে কেউ চাপিয়ে দেয়নি। মেমই হোক, যা-ই হোক, তাঁর স্ত্রী তো!

ছোটোবেলায় নিরাভরণ দেহে সমীরণ চ্যাটার্জী যখন পুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তখন কেউ কি ভাবতে পেরেছিল যে ঐ উলঙ্গ ছেলেটা একদিন বড়ো হয়ে মেম বিয়ে করবে? ওরা শুনলে সবাই অবাক হয়ে যাবে। আমাদের সমীর মেম বিয়ে করেছে। হেঁজি-পেঁজি নয়, খাস বিলিতী মেম! কিন্তু তাতে কি পেট ভরে? সমীরণ চ্যাটার্জী কিছু ইংরিজীর অভিধান নয়। কোট-প্যাণ্ট-টাই বেঁধে আপিসের কাছে ইংরিজী বলতে পাবেন, এমন কি দরকার হলে লাঞ্চ এবং ডিনার-টেবিলটাও ম্যানেজ করে নিতে পারেন। কিন্তু তা বলে রাত্রের অন্ধকারে, ঘুম-জড়ানো চোখে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ইংরেজী বলা! আর সেই সব কথা—যার প্রতিশব্দ কোনো টেক্সট্-বুকে অথবা ডিক্সনারীতে লেখা থাকে না।

কিন্তু এলিজাবেথ? সত্যি ওর মতো মেয়ে পাওয়া সমীরণ চ্যাটার্জীর পরম ভাগ্যের কথা। ও বোধহয় স্বামীর মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল, তাই বিদেশে থেকেও বাংলা ভাষা রপ্ত করবার চেষ্টা করেছিল। সংসারের হিন্দুয়ানা শেখবার জন্যও আগ্রহ কম ছিল না। কিন্তু সে-সব কে শেখাবে তাকে? ও-সব শেখবার জন্য যে সময়, যে অবসর, যে প্রাচুর্য থাকার প্রয়োজন, সমীরণ ও এলিজাবেথ চ্যাটার্জীদের জীবনে তা কোথায় ছিল?

না, ঐ-সব কথা চিন্তা করে সমীরণ চ্যাটার্জী আজকের রাত্রের শান্তিটুকু আর নষ্ট করবেন না। রাত্রে শুয়ে শুয়ে দিনের সূর্যের জন্য শোক করে পৃথিবীর কোনো উপকারই করা যাবে না। নিজের বিছানায় কম্বলটা বুক পর্যন্ত টেনে নিয়ে মিঃ চ্যাটার্জী ভাবলেন, এমন রাত্রি আর ক'টাই বা তাঁর জন্য তোলা আছে। জীবনের শেষ ঘণ্টা বাজতে দেরী নেই বলেই বোধহয় সময়টা জানবার জন্য ঘড়ির দিকে বারবার নজর দিতে ইচ্ছে করছে। পৃথিবী যতোই নির্দয় হোক, কিন্তু ঘুম এখনও তাঁর প্রতি অকৃপণ হয়নি। তাই তাঁর ইঙ্গিতেই চোখের উপর যেন মন্ত্রপূত শান্তির জল ঝরে পড়ল।

ভোরবেলায় হিমালয় সিং ওঁকে যখন জাগিয়ে দিল, অতিথিরা তার কিছু আগেই উঠে পড়েছেন। ওদের ঘরের জানলা দিয়ে বরফ পাহাড়ের সামান্য একটা অংশ দেখা যায়। বোধহয় একসঙ্গে ওরা দুজনে সেই বরফের চূড়ায় সূর্য-ওঠা দেখছিল। মিস্টার চ্যাটার্জীর পায়ের শব্দে ওরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ড্রইংরুমে ঢুকলো।

"তোমাদের ঘুমের কোন অসুবিধা হয়নি তো?" মিস্টার চ্যাটার্জী জিজ্ঞাসা করলেন।

"মোটেই না।" প্রশান্ত বললে।

হিমানী বললে, "আপনার কম্বলটা খুব কাজে লেগে গিয়েছে।

লজ্জা করে তখন যদি না নিতাম, তাহলে রাত্রে কষ্ট পেতে হতো।”

মিঃ চ্যাটার্জী ওর কথায় বেশ আনন্দ পাচ্ছেন। প্রশান্ত বললে, “হিমালয় সিং এর মুখে শুনলাম, ইস্ট-ভিউ থেকে চমৎকার সূর্যোদয় দেখা যায়।”

“হ্যাঁ।” ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সমীরণ চ্যাটার্জী বললেন, “যদি সূর্য-ওঠা দেখতে চাও, তবে এখনি বেরিয়ে পড়ো। জায়গাটা খুবই কাছে। ফিরে এসেও বেড্-টি উপভোগ করতে পারবে।”

ওরা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে রাজী হয়ে গেল। পশমের স্কার্ফটা গায়ে জড়াতে জড়াতে হিমানী বললে, “আপনি?”

লোভ হয়েছিল মিস্টার চ্যাটার্জীর। ওদের সঙ্গে গল্প করতে করতে ঈস্ট-ভিউ-এর জঙ্গলে বসে সূর্যোদয় দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। হেসে বললেন, “তোমরা যাও। আমি তো অনেকবারই দেখেছি। তা ছাড়া পথে বৃদ্ধ বিবর্জিত!” মিস্টার চ্যাটার্জী এবার জোরে হাসবার চেষ্টা করলেন। ব্র্যাকেটে টাঙানো বাইনাকুলারটা দেখিয়ে, ওটাও হিমানীকে নিয়ে যেতে বললেন।

ওরা বেরিয়ে গেল। মিস্টার চ্যাটার্জী তাঁর প্রিয় জানলার কাছে এসে বসলেন। সকালে এ-জানলার কোন দাম থাকে না। সূর্যাস্তের সময় তেমনি এর তুলনা নেই। যৌবনের প্রারম্ভে পর্বতের পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে শিখরের দিকে তাকাতে হয়; আর বার্ধক্যের প্রান্তদেশে পাহাড়ের শিখর থেকে ঘাড় নিচু করে উপত্যকার দিকে তাকিয়ে থাকতেই ভালো লাগে।

তিক্ত বিষণ্ণতায় মনটা হঠাৎ যেন ভরে উঠতে চাইছে। ওঁর যেন কল্পনা করতে ইচ্ছে করছে, তাঁরই সন্তান পুত্রবধূর হাত ধরে ঈস্ট-ভিউ থেকে সূর্যোদয় দেখতে গিয়েছে। তাঁর স্ত্রী যেন এখনও পাশের ঘরে ঘুমিয়ে রয়েছেন। একটু পরে সবাই ফিরবে; হৈ-হৈ

মিস্টার চ্যাটার্জীর ঐ আকস্মিক প্রশ্নে সমস্ত পরিবেশটাই হঠাৎ পাল্টিয়ে যেতো। কিন্তু হিমানী রক্ষা করে দিল। আদুরে গলায় সে বললে, "ঠিক বলেছেন। ভদ্রতা করতে যাচ্ছে আপনার সঙ্গে।" সে এবার খিলখিল করে হেসে উঠলো। সেই হাসির ছোঁয়াচে বাকি দুজনও হা-হা করে হাসতে শুরু করলেন।

চা খাওয়ার পর প্রশান্ত আসল কথাটা তুলেছিল। "এবার কোনো হোটেলে গিয়ে উঠা যাক, নিশ্চয়ই জায়গা পাওয়া যাবে।" মিস্টার চ্যাটার্জীর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। "তোমাদের কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে?"

"না তো।"

"তবে কেন সামান্য একদিনের জন্য আর হোটেলে যেতে চাইছো? আমি তোমাদের কেউ নই। কিন্তু তোমার বাবার বন্ধু তো হতে পারতাম। মনে করো না, আমি তোমাদের কোনো বহুদিনের সংসারের বাইরে থাকা কাকা। অনেকদিন পরে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছে।" নিজের মুখ দিয়ে যে এসব কথা বেরোতে পারে, মিস্টার চ্যাটার্জীর নিজেরই তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। সারাজীবনই তো মনের ভাব মনের মধ্যে চেপে রাখতে হলো, কখনও সাহস করে কথা বলতে পারলেন না।

ওদের যাওয়া হলো না। ওরা ভাবলো, রাস্তায় বেরিয়ে এমন মানুষও তাহলে খুঁজে পাওয়া যায়। "ঠিক যেন গল্পের মতো মনে হচ্ছে"—হিমানী বলে ফেলেছিল।

মিঃ চ্যাটার্জী মুখে কিছুই বলেননি। মনে মনে ভেবেছিলেন, এলিজাবেথকে বিয়ে করে যেদিন বার্মিংহামের সেই ছোট ফ্ল্যাটটাতে উঠে এসেছিলেন, সেদিন তাঁরও মনে হয়েছিল সমীরণ চ্যাটার্জী রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, ঠিক যেন কোন গল্পের নায়ক। (তখন কি জানতেন, সমস্ত পথ অতিক্রম করে ঘরের কাছে এসে গল্পের

মায়কের হঠাৎ মনে পড়বে, বন্ধ দরজার চাবিটা অন্য জায়গায় ভুলে ফেলে এসেছেন।)

"আমি একটু ঘুরে আসছি।" প্রশান্ত ব্রেকফাস্টের পর একলা বেরিয়ে পড়লো। হিমানী ওর সঙ্গে যেতে পারতো, কিন্তু লাঞ্চের পর এখান থেকে দু'হাজার ফুট উঁচু ঝুলনপুরাতে আপেলের বাগান দেখতে যাবে। সেইজন্য কাটা পা-কে একটু বিশ্রাম দিচ্ছে।

ব্রেকফাস্টের পর সমীরণ চ্যাটার্জী নিজের আরাম-কেদারায় এসে বসেছিলেন। হাতে একটা বই ছিল। কিন্তু দৃষ্টিটা জানলা দিয়ে বাইরে এসে পড়েছিল। এইভাবেই অনেকক্ষণ কেটে যেতো, যদি-না হিমানী এসে ঘরে ঢুকতো।

"বই পড়ছেন ?" হিমানী কাছে এসে দাঁড়ালো।

"পড়ছি কই ? পড়বার চেষ্টা করছি। এই বয়সে কিছুই করা যায় না। শুধু যা করবার ইচ্ছে হয়, তাই করবার জন্য বার-বার চেষ্টা করি। কিন্তু হয় না।" মৃদু হেসে সমীরণ চ্যাটার্জী বললেন।

হিমানী কিন্তু অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলো। "আপনি তো বেশ লোক। আপনি যে সমস্ত জীবনটা বিলেতে কাটিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন তা তো বলেননি !"

একটু হাসবার চেষ্টা করলেন মিঃ চ্যাটার্জী। "এতে বলবার কী আছে, মা ? কিন্তু খবরটা তুমি কোথা থেকে শুনলে ?"

"কেন রাস্তায়। ওরাই বললে, সেই যে ছোটবেলায় আপনি দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, আর কখনও আসেন নি। এতোদিনে আবার···"

"সর্বতীর্থসার জননী আমার, তাই এসেছি আবার"—সমীরণ চ্যাটার্জী রসিকতা করলেন।

"কিন্তু জানেন, আপনাকে দেখলে কিছুই বোঝা যায় না।" হিমানী বললে।

"বটে ?" সমীরণ চ্যাটার্জী কপট রাগ প্রকাশ করলেন।

"সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন," হিমানী মৃদু হেসে বললে।

"সেটা কিন্তু মোটেই ভালো কথা নয়। চল্লিশ বছর একটা দেশে কাটিয়ে, তার কোনো ছাপ নিয়ে আসতে পারলাম না?"

হিমানীর সঙ্গে অনেক কথা হলো। নিজের কিছুও গোপন রাখেনি সে। প্রশান্ত যে ভালবেসে অন্য জাতের মেয়ে বিয়ে করেছে, তাও জানাতে দ্বিধা করেনি। বাড়িতে অনেক আপত্তি হয়েছিল। কিন্তু ওরা কথা শোনেনি। প্রশান্তের বাবা ওদের বাড়িতে থাকতে দেননি। কিন্তু মার সঙ্গে ওরা দুজন মাঝেমাঝে লুকিয়ে দেখা করে আসে।

নিজের মায়ের মুখটাও সমীরণ চ্যাটার্জীর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মা তাঁকে ক্ষমা করেননি। কিন্তু ভালবাসাটা বন্ধ করতে পারেননি। তাই পার্সেলে বড়ি পাঠিয়েছেন।

হিমানী বললে, "আপনি নিজের দেশকে খুব ভালবাসেন, তাই না? না হলে, শেষবয়সে এর মায়া কাটাতে পারলেন না। আবার আসতে হলো।

চমকে উঠলেন সমীরণ চ্যাটার্জী। "ভালবাসা? দেশকে ভালবাসা?" হ্যাঁ, খুব ভালবাসেন তিনি। না হলে, শেষজীবনে কেন দেশে ফিরে এলেন তিনি? স্বাধীনতার দশ বছর পরেও বিলেত যাবার জন্য যে দেশেব লোকদের হ্যাংলামোর অন্ত নেই; বিলেত না গেলে যে দেশের ধনীর দুলালদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, টাকা-কড়ি পাঠানোর সামান্য অসুবিধার জন্য রিজার্ভ-ব্যাঙ্ককে গালাগালি না দিয়ে যেখানে কেউ অন্ন স্পর্শ করে না, সেই দেশের লোক হয়ে কিনা হাতের মুঠোর মধ্যে স্বর্গ পেয়েও হেলায় ত্যাগ করে চলে এলেন?

হিমানীর সামনে মনকে সে প্রশ্ন করতেও যেন সাহস হলো না। অন্তর্যামী যদি জিজ্ঞাসা করে বসে, ভালবাসার পাত্রকে মানুষ বুঝি যৌবনে অবজ্ঞাভরে ত্যাগ করে, বার্ধক্যে আলিঙ্গন করে?

ভয় হলো। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বুকটা যেন কেঁপে উঠলো। তখনকার মতো কথার মোড় ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করলো। হিমানীই তার সুযোগ করে দিল। জিজ্ঞাসা করলো, "আপনি বুঝি খুব বই পড়েন ?"

"না, একটামাত্র বই আছে, সেইটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ি। এক ফরাসী ভদ্রলোকের লেখা—বুড়ো হবার উপায়।"

যৌবনে উচ্ছল হিমানী অবাক হয়ে গেল। "সাদা চুল কাঁচা করবার উপায়, মরা মানুষ বাঁচাবার উপায় নিয়েই তো মানুষ মাথা ঘামায় জানতাম। বুড়ো হবার আবার উপায় কী ? যখন সময় আসবে তখন এমনিই বুড়ো হবো।"

মিঃ চ্যাটার্জী মাথা নাড়লেন। "অতো সহজ নয়। বুড়ো হওয়ার থেকে কষ্টকর অভিজ্ঞতা পৃথিবীতে নেই। বিনা যন্ত্রণায়, সহজভাবে বৃদ্ধ হওয়া-খুব শক্ত।

লেখক বলছেন, বুড়ো হবার সবচেয়ে সোজা উপায় হলো—বুড়ো না হওয়া—not to grow old ; আর একান্তই যদি বুড়ো হতে হয়, তাহলে to grow in tranquility."

আরও কথা হতো। কিন্তু প্রশান্ত আবার ফিরে এল। সমীরণ চ্যাটার্জী বললেন, "হিমানীকে সাবধান। ও এখন থেকেই বুড়ো হবার উপায়গুলো জেনে নিতে চাইছে।"

প্রশান্ত বললে, "কুড়ি পেরোতে না-পেরোতেই ও বুড়ী হয়ে গিয়েছে।"

"বুড়ী হয়েছি কিনা তা ও-বেলায় ঝুলনপুরাতে ওঠবার সময় বুঝিয়ে দেবো। দেখো, তোমার থেকে আগে আমি উঠে যাবো। গাছ থেকে আমি আপেল পেড়ে খাবো।"

মিস্টার চ্যাটার্জী ওদের বিরোধে সালিশী করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "রাগ করছো কেন মা ? প্রত্যেক মেয়ে চিরকালই মনে-মনে বুড়ী। আর পুরুষরা বুড়ো হয়েও চিরকাল

খোকা থেকে যায়। আমার স্ত্রীকেও তো চিরদিনই ওইরকমই দেখেছি।"

গোলমালটা আরও বাড়তো, কিন্তু হিমালয় সিং এসে জানিয়ে গেল, এগারোটার মধ্যে লাঞ্চ সেরে নেওয়া প্রয়োজন। ওঁরা যদি ঝুলনপুরাতে যেতে চান তবে একটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে, না হলে সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারবেন না।

কথা না বাড়িয়ে হিমানী স্নান করতে চলে গেল। স্নান সেরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে যখন সিঁথিতে সিঁদুর দিতে লাগল, মিস্টার চ্যাটার্জী তখন যেন এক নতুন দৃশ্য দেখতে পেলেন। খুব ছোটবেলায় তাঁর মা-ও গোবরডাঙার বাড়িতে ছোট আয়নার সামনে বসে ঐভাবেই সিঁদুর পরতেন। তারপর ওঁর খুব ইচ্ছে হয়েছিল, এলিজাবেথ-ও ঐভাবে সিঁদুর পরে। ওঁর কথামতো সে একদিন প'রেও ছিল, কিন্তু গাউন-পরা দেহের সিঁথিতে লাল রেখাটা যেন মোটেই মানায়নি।

ভিজে চুলগুলো পিঠে এলিয়ে দিয়ে হিমানী খাবার টেবিলে এসে বসলো। ওদের সঙ্গে খেতে সে প্রথমে কিছুতেই রাজী হয়নি। বলেছিল, "আপনাদের খাইয়ে, তবে আমি খাবো।"

মিস্টার চ্যাটার্জীর মনটা সুগভীর প্রশান্তিতে ভরে উঠেছিল। মনে-মনে বলেছিলেন, আহা, এই না-হলে বাংলাদেশের মেয়ে। কিন্তু জোর করে ওকেও খেতে বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "আমি সায়েব মানুষ, ও-সব হিঁদুয়ানী আমার সহ্য হয় না।"

খেতে খেতে মিস্টার চ্যাটার্জী বলেছিলেন, "তোমরা সাবধানে পাহাড়ে উঠো।"

হিমানীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিলেন, "পাহাড়ে না উঠতে পারলেই যে মেয়েরা বুড়ী হ'যে গিয়েছে তা প্রমাণ হয় না।"

হিমালয় সিংকে সঙ্গে করে, খাওয়াদাওয়ার পরে ওরা বেরিয়ে পড়ল।

প্রশান্ত বলেছিল, "পাহাড়ে ওঠার জন্য শাড়ী জিনিসটা তেমন সুবিধের নয়, শ্ল্যাক্‌সটা প'রে নাও।"

হিমানী রাজী হলো না। বললে, "বাঙালীর মেয়ে আমি শাড়ী পরে যাবো। শ্ল্যাক্‌সের ঐ হচ্‌ পচ্‌ আমার পছন্দ হয় না।"

কথাটা হিমানী কিছু ভেবেচিন্তে বলেনি। কিন্তু সমীরণ চ্যাটার্জীর মনের বন্ধ ঘড়িটা ঐ একটি কথাতেই হঠাৎ নাড়া খেয়ে যেন চলতে লাগল।

বাড়িটা খালি হয়ে গিয়েছে। কেউ কোথাও নেই। ওঁর ঘরের টাইমপীসটা শুধু কথা বলছে। ইজি-চেয়ারে বসে সমীরণ চ্যাটার্জীর মনে হলো, ঘড়িটাও যেন ঐ একই কথা বলছে একমনে ওঁর কানের কাছে ব্যঙ্গ করে বলছে—হচ্‌ পচ্‌, হচ্‌ পচ্‌, হচ্‌ পচ্‌।

সারাজীবনটাই হচ্‌ পচ্‌ করে ফেলেছেন সমীরণ চ্যাটার্জী—গোবরডাঙার ছেলে বার্মিংহামের মেয়েকে বিয়ে করে। হিমানী প্রশান্তও করেছে। নিজের জাতের বাইরে বিয়ে করে এখনও ভালো আছে। হাসিতে খুশিতে ভরে রয়েছে। কিন্তু পরে বুঝবে। সমীরণ চ্যাটার্জীও প্রথমে বুঝতে পারেননি। সমীরণ চ্যাটার্জী পরে বুঝেছিলেন, ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করে ইংলণ্ডে থেকে যাওয়াটা ঠিক ঘর-জামাই থাকবার মতো।

সমীরণ চ্যাটার্জী চেষ্টার ক্রটি করেননি। সব ভুলে গিয়ে একেবারে সায়েব হয়ে যাওয়াকেই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করলেই কি পারা যায়?

এলিজাবেথ বুঝতে পেরেছিল। বলেছিল, "চলো, আমরা ইণ্ডিয়াতে ফিরে যাই।"

কিন্তু ইচ্ছে করলেই ফেরা যায় না। টাকার দরকার। দেশে গিয়েও অন্নের সংস্থান করতে হবে। কোনো কাজ জোগাড় করতেও সময় লাগবে—যা ভারতবর্ষে চাকরির অবস্থা! তার থেকে বহুদূরের বার্মিংহাম-ই ভালো। জার্মানিতে দাদার দেনাটাও শোধ হচ্ছে।

টাকা জমিয়ে কলকাতাতেই হেড-আপিসটা নিয়ে চলে যাবে। আমরা সবাই মিলে ঐখানে থেকে যাবো।"

সত্যি তো এমন হতে পারে! সমীরণ চ্যাটার্জী স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, তিনি কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন। এলিজাবেথকে নিয়ে প্রতি শনিবার গোবরডাঙ্গায় বেড়াতে যাচ্ছেন। ছিপ্ ফেলে পুকুর থেকে মাছ ধরছেন। হাট থেকে দর-দাম করে পাটালি কিনছেন।

সেই স্বপ্নকে আরও রঙীন করবার ইন্ধন শীঘ্রই জুটে গেল। সেদিন ওঁরা দুজনে হাত-ধরাধরি করে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। ব্রাইট লেনের সামনে যে পার্কটা আছে সেইখানে গিয়ে সন্ধ্যার পরও দুজনে বসেছিলেন। সমীরণ চ্যাটার্জী ভাবছিলেন কেমন করে কিছু পয়সা রোজগার করা যায়, এলিজাবেথকে সুখে রাখা যায়।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল সেদিন। ওভারকোটের মধ্য দিয়েও শীতের ছুঁচগুলো দেহের মধ্যে বিঁধছিল। ঠিক সেই সময়েই এলিজাবেথ ওঁর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়েছিল। আস্তে আস্তে বলেছিল, "ডার্লিং, তোমাকে একটা কথা বলতে হবে, ক'দিন থেকেই ভাবছি।"

"কী কথা ?"

"সমীর, বোধহয় তোমাকে আমি সন্তান উপহার দিতে চলেছি," এলিজাবেথ কোনোরকমে কথাগুলো বলে, লজ্জায় মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

দারিদ্র্য, অভাব, অনটনের মধ্যে সন্তান—কম চিন্তার কথা নয়। তবুও সমীরণ চ্যাটার্জীর দেহের মধ্য দিয়ে যেন আনন্দের বিদ্যুৎ বয়ে গেল। সন্তান! এলিজাবেথ চ্যাটার্জীর দেহে তাঁর সন্তান আসছে!

পার্কের বেঞ্চি থেকে উঠে পড়ে এলিজাবেথ বলেছিল, "চলো, এবার ফেরা যাক।"

মাতৃত্ব-রহস্যের কিছুই তখন তিনি বুঝতেন না। তবু

এলিজাবেথের হাতটা ধরে সমীরণ চ্যাটার্জী বলেছিলেন, "ডার্লিং, অতো জোরে জোরে হেঁটো না। তোমার এখন থেকে খুব আস্তে আস্তে হাঁটতে হবে।"

ওঁদের বাড়িটা পার্ক থেকে বেশী দূরে নয়। তবু সমীরণ চ্যাটার্জী সেদিন হেঁটে যেতে রাজী হন নি! একটা গাড়ি ভাড়া করেছিলেন। গাড়িতে উঠে বলেছিলেন, "যা-হয় হবে, কাল থেকে তুমি আর আপিস যেয়োনা। চাকরি ছেড়ে দাও।"

এলিজাবেথ হেসে বলেছিল, "এখন থেকেই উতলা হতে নেই। এখনও অনেক দেরি।"

যেন এবার নতুন জীবন শুরু হলো। যে জীবনের জন্য সমীরণ চ্যাটার্জী একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এলিজাবেথ বলেছে, "বিদেশে এসে তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছো। মানুষ তোমাকে অবহেলা করেছে। তোমার পৈতের জন্য টিটকিরি দিয়েছে, তাই না? এবার তুমি প্রতিশোধ নিয়ে নিয়ো। ছেলেকে তোমার মনের মতো মানুষ কোরো।"

সমীরণ চ্যাটার্জীর মনে হয়েছিল, ভুলপথে যাচ্ছেন তিনি। যে দেশে তিনি বাস করেন তার জীবনস্রোত পশ্চিমে ছুটে চলেছে। হঠাৎ নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখবার জন্য একটা বিন্দু স্রোতের বিপক্ষে পূর্বদিকে যাবার চেষ্টা করলে, ফল ভালো হতে পারে না। তা ছাড়া এলিজাবেথ? প্রথম সন্তানকে কেন্দ্র করে নোতুন মায়েরও তো স্বাদ-আহ্লাদ থাকতে পারে।

সমীরণ চ্যাটার্জী বলেছিলেন, "তা হয় না। যে আসছে তুমি তার মা। তোমার ইচ্ছেই সেখানে বড়ো হওয়া উচিত। তোমার খুশিমতো তুমি তাকে মানুষ করবে।"

এলিজাবেথ বলেছিল, "যদি মেয়ে হয় তবে আমার। আর ছেলে হলে তোমার।"

সমীরণ চ্যাটার্জী তখনও বুঝতে পারেননি যে [illegible]

স্রোত একজায়গায় ঠোকাঠুকি করে ওঁদের দুজনের জীবনকে আরও জটিল করে তুলছে।

প্রথম-সন্তানকে বুকে করে এলিজাবেথ যেদিন হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিল, সেদিনও সমীরণ চ্যাটার্জী পৃথিবীকে রঙীন কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখেছিলেন। এলিজাবেথ বলেছিল, "আমাকে হারিয়ে দিয়ে, তুমিই জিতলে তো ? এখন ছেলে মানুষ করো তুমি।"

"ছেলে মানুষ করার আমি কী জানি ?" মৃদু হেসে সমীরণ চ্যাটার্জী বলেছিলেন।

"সে আমি জানিনা। তোমাদের গোবরডাঙ্গার ছেলেরা যেভাবে মানুষ হয়, ওকেও ঠিক সেইভাবে মানুষ হতে হবে। তুমি হুকুম করবে, আমি হুকুম তামিল করবো," এলিজাবেথ বলেছিল।

এলিজাবেথের মা চিঠি লিখেছিলেন, "চার্চে একবার খবর দিয়ো।"

এলিজাবেথ বলেছিল, "বাঃ, ও তো হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলে, চার্চে কেন খবর দেবো ?"

সমীরণ চ্যাটার্জীকে এলিজাবেথ বলেছিল, "এখন অন্য কাজ ছেড়ে ছেলের একটা নাম দাও।"

"কেন, তুমি দাও না।"

"উঁহু," এলিজাবেথ মাথা নেড়েছিল। "তোমাদের কী নাম হয়, আমি কেমন করে জানবো ? আমি তো একটামাত্র ইণ্ডিয়ান নাম জানি, সেটা তো তোমার।"

সমীরণ চ্যাটার্জী ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে আরম্ভ করেছিলেন। মা বেঁচে থাকলে নামের জন্য তাঁর কাছেই একটা চিঠি লেখা যেতো। কী নাম দেওয়া যায় ? সমীরণ চ্যাটার্জী চিন্তা করতে লাগলেন।

বিছানায় বসে বসে ছেলেকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে এলিজাবেথ বললে, "খুব মন দিয়ে চিন্তা করছো তো ! আমাকে অবুঝ পেয়ে

ছেলের আমার যদি একটা খারাপ নাম দিয়ে দাও, তাহলে ভালো হবে-না-কিন্তু!"

সমীরণ চ্যাটার্জী হেসে ফেললেন। তাঁর মনের মধ্যে তখন নাম এসে গিয়েছে। এমন নাম, যা মানুষের ইতিহাসে চিরদিন বেঁচে থাকবে। যাঁর নাম, তিনিও চ্যাটার্জী ছিলেন। গদাধর হয়ে জন্মে, রামকৃষ্ণ হয়েছিলেন।

এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করলে, "পেয়েছো?"

"হ্যাঁ, গদাধর চট্টোপাধ্যায়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, আমাদের সন্তান যেন ঐ নাম সার্থক করে তোলে।"

ছোট্ট ফুলের মতো ছেলের মুখে চুমো খেয়ে এলিজাবেথ বলেছিল, "বাছা আমার, সোনা আমার, মাই স্যুইটি নিশ্চয় পারবে, তুমি দেখে নিয়ো।"

মিস্টার সমীরণ চ্যাটার্জী এবার একটু নড়ে বসলেন। পুরনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে সামনের এই পাহাড় ও প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করে তিনি কোথায় চলে গিয়েছিলেন! ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। ওঁর অতিথিদের ফেরবার সময় হতে আর দেরি নেই।

এলিজাবেথকে সামনে পেলে সমীরণ চ্যাটার্জী সেই পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিতেন। বলতেন, "কী হলো? এলিজাবেথ, তোমার কথা তো সত্যি হলো না।"

কিন্তু কোথায় এলিজাবেথ! সমীরণ চ্যাটার্জীর সমালোচনা শোনবার অনেক আগেই সে পালিয়েছে। স্বামীকে, সন্তানকে, সংসারকে ফাঁকি দিয়ে এলিজাবেথ চ্যাটার্জী অন্যজগতে চলে গিয়েছে।

এমন কথা তো ছিল না, সমীরণ চ্যাটার্জী ভাবলেন। তোমারই ভরসায় বন্দরের মায়া ত্যাগ করে নৌকাতে এসে বসলাম। অথচ আমাকেই মাঝ-দরিয়ায় ফেলে রেখে তোমার জীবনের খেয়া কোন

অজানা ঘাটের উদ্দেশে রওনা দিল। হয়নি, তাঁর কোনো স্বপ্নই সফল হয়নি। ওঁরা দুজনে খোকাকে নিয়ে বাংলাদেশে বেড়াতে আসবেন ঠিক ছিল। ওঁরা দুজনে সম্ভব হলে সেইখানেই থেকে যাবেন ঠিক ছিল।

কী আশ্চর্য! জন্মভূমি বোধ হয় সমীরণ চ্যাটার্জীর মতো সন্তানকে চাননি। না-হলে সেই যে দেশ ছাড়লেন, আর একবারও কেন ফিরতে পারলেন না? আর যখন ফিরলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই জীবনটা যেন কেটে গেল। গদাধরের নাম দিয়েই যেন ওঁর কর্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। এলিজাবেথের উচ্চারণ করতে কষ্ট হতো—গডাডার, গাড্ডাডার চট্টোপাড্ডা। তবু আনন্দ ছিল তার। বলেছিল, "আমাকে তো পারোনি, কিন্তু ওকে শেখাও। ওকে তোমার মতো করে গড়ে তোলো। ওকে তো একদিন আমাদের সঙ্গে ইণ্ডিয়ায় ফিরে যেতে হবে। সেখানে যেন ওর কোনো কষ্ট না হয়। তোমার ছেলে হিসেবে ও যেন পরিচয় দিতে পারে।"

কিন্তু সময়? সময় কোথায় সমীরণ চ্যাটার্জীর? ব্যবসাকে দাঁড় করাতে হবে, তাকে বড়ো করতে হবে। তবে তো ইণ্ডিয়ায় ব্রাঞ্চ খোলা যাবে।

গদাধর চ্যাটার্জী ওঁর চোখের সামনেই ক্রমশঃ বড়ো হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওর জন্য কোনো সময়ই দিতে পারেননি সমীরণ চ্যাটার্জী। গদাধরের সেই বয়সের একটা ছবি আজও ওঁর কাছে আছে। ঠিক যেন ওর মায়ের মুখটি কেটে বসানো। সেই লাল রঙ, সেই নীল নীল চোখ, সেই কটা চুল। সমীরণ চ্যাটার্জীর গায়ের রঙটা ভাগ্যে পায়নি। মনে মনে সমীরণ চ্যাটার্জী খুশী হয়েছেন। ঈশ্বর ভালোই করেছেন। ওকে দেখলে বর্ণসংকর মনে হয় না। শুধু পেটের

কাছে অনেকটা জায়গা জুড়ে চামড়ার রঙটা কালো—ঠিক যেন ভারতবর্ষের ম্যাপ। সাদা কাগজের উপর অসাবধানে যেন কালির দোয়াত উল্‌টিয়ে গিয়েছিল। ভালোই হয়েছে, সে জায়গাটা বাইরের কারও নজরে পড়ে না।

স্ত্রী এবং গদাধরকে নিয়ে যেদিন তিনি দেশে ফিরবেন, সবাই অবাক হয়ে যাবে। বলবে, "আহা সুন্দর ছেলেটি তো! এমন ছেলের নাম গদাধর না হলে মানায়?"

কিন্তু ভাঙা-ভাঙা দু'একটা বাংলা কথা ছাড়া গদাধর বাঙালীদের আর কিছুই শেখেনি। এলিজাবেথ বলেছে, "ওর দিকে একটু নজর দাও।"

সমীরণ চ্যাটার্জী বলেছেন, "দাঁড়াও, আগে ব্যবসাটা ঠিক করে নিই। তারপর তো ইণ্ডিয়ায় চলে যাবো।"

এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করেছে, "ততোদিন কী হবে?"

সমীরণ চ্যাটার্জী উত্তর দিয়েছেন, "ততোদিন মায়ের কাছে শিখুক, মা তো আর যা-তা মেয়ে নয়। আর তা ছাড়াও তুমি ভেবো না, এলিজাবেথ। গদাধর তো আমারই সন্তান। তিন হাজার বছরের পুরনো রক্তের ধারা কি সহজে অস্বীকার করা যায়?"

কিন্তু সময়? সমীরণ চ্যাটার্জীর ভাগ্যে বোধ হয় কোনো সময় মিলবে না। দিনরাত পরিশ্রম করে ব্যবসায়ে যখন একটু আশার আলো দেখতে আরম্ভ করেছেন, তখন জার্মান কেমিক্যালের প্রতিযোগিতায় সব যায়-যায় অবস্থা।

সমীরণ চ্যাটার্জী হয়তো একেবারে ভেঙে পড়তেন। কিন্তু এলিজাবেথ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে। বলেছে, "ভয় কী? আমি তো আছি, আর একবার চেষ্টা করে দেখো।"

আর একবার চেষ্টা করতে গিয়ে সমীরণ চ্যাটার্জীকে লণ্ডনে এসে অনেকদিন থাকতে হয়েছে। এলিজাবেথ সঙ্গে আসতে পারেনি। বার্মিংহামে ওর নিজের চাকরি ছেড়ে দিলে সংসার চলবে কী করে?

বার্মিংহামের এক ইস্কুলে ওঁরা গদাধরকে পাঠিয়েছেন। গদাধর সম্বন্ধে চিন্তা করবার মতো সময়ও নেই সমীরণ চ্যাটার্জীর। কেবল ব্যবসা আর ব্যবসা।

লণ্ডনে থাকার সময় দু'একজন নিজের দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। এতোদিন একটানা বিলেতে প'ড়ে রয়েছেন শুনে তারা অবাক হয়ে গিয়েছে। "এখানেই যখন ঘর সংসার পেতে বসেছেন তখন আর বোধ হয় ফিরতে ইচ্ছে করে না?"

সমীরণ চ্যাটার্জী উত্তর দিয়েছেন "আজ্ঞে, মোটেই না। দেশে ফেরবার জন্যই তো এই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছি। আর বিয়ে? যাঁকে আমি বিয়ে করেছি, তিনি না থাকলে সমীরণ চ্যাটার্জীর নাম পৃথিবীর খাতা থেকে অনেকদিন আগেই খারিজ হয়ে যেতো। কিন্তু দেশে আমাকে ফিরতেই হবে। আমার ছেলে, সে তো নিজের দেশই দেখলো না।"

"মামার দেশটাও তো দেশ," একজন বাঙালী ভদ্রলোক রসিকতা করে বলেছিলেন।

"আর কেনই বা ফিরবেন? ইণ্ডিয়াতে কী আছে? কিচ্ছু নেই, উপায় থাকলে আমরাও ফিরতাম না।" আর এক ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

"কী বলছেন আপনারা?" সমীরণ চ্যাটার্জী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। "আমার দেশে—যে দেশে আমি জন্মেছি; যে দেশের মাটিতে আমার চৈতন্যের উদয় হয়েছে, সেখানে আমি ফিরে যাবো না? মেম বিয়ে করেছি বলে ঘরজামাই হয়ে শ্বশুরবাড়িতে চিরদিন থেকে যাবো?"

সেইবারই হারাধন ভট্টাচার্যিকে সঙ্গে করে সমীরণ চ্যাটার্জী বার্মিংহামে ফিরে এসেছিলেন। এলিজাবেথকে বলেছিলেন, "ছেলের

পৈতে দেবো। অনেক কষ্টে এই ভদ্রলোককে ধরে এনেছি, লণ্ডনে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।”

হাতে সেবার কিছু টাকা পেয়েছিলেন সমীরণ চ্যাটার্জী। সেই পয়সায় এলিজাবেথের জন্য একটা শাড়ী কিনে এনেছিলেন। ও দেশে শাড়ীর অনেক দাম। কিন্তু তাই বলে, ছেলের পৈতেতে ছেলের মা গাউন পরে বসে থাকবে তা সহ্য করা যায় না।

এলিজাবেথও বলেছিল, “সত্যি তো, আমিও শাড়ী পরবো।” কিন্তু শাড়ী পরতে যে অনেক কষ্ট। ঘরের মধ্যে ধস্তাধস্তি করে সমীরণ চ্যাটার্জীকেই কোনোরকমে শাড়ীটা পরিয়ে দিতে হয়েছিল। সিঁদুরের অভাবে কপালে কুমকুম পরেছিল এলিজাবেথ।

ছেলেকে কোলে বসিয়ে সেদিন এলিজাবেথ একটা ছবি তুলিয়েছিল। সে ছবিটা আজও অ্যালবামে রয়েছে।

মিস্টার সমীরণ চ্যাটার্জী আলমারির ভিতর থেকে কালো চামড়ায় বাঁধানো অ্যালবামটা বার করে আনলেন। শাড়ী প'রে এলিজাবেথকে তো মন্দ দেখায়নি। ছবি তোলবার সময় মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়েছিল। গদাধর মায়ের কোলে বসে নিজের ন্যাড়া মাথায় হাত দিয়েছে। মা ও ছেলে দুজনেই যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

মাথা ন্যাড়া করবার কথা শুনে তো গদাধর একেবারে কেঁদে ফেলেছিল্। ওদের ইস্কুলে তো কত ছেলেই পড়ে। কিন্তু তাদের কেউই তো এমন গলায় সুতো ঝুলিয়ে মাথা কামায়নি?

মা বলেছিলেন, ছিঃ, ‘মাই ডিয়ার বয়, তুমি না ব্রাহ্মিন? তুমি না টোশাইস-বর্ন?”

কোট-প্যাণ্ট খুলতে খুলতে গদাধর কান্নাকাটি সুরু করেছিল। ইস্কুলে আজ দরকারী ফুটবল খেলা রয়েছে। ও না থাকলে টীম কানা হয়ে যাবে। তা না, কোথাকার এই ঝঞ্ঝাট। গদাধর মাকে চুমু খেয়ে বলেছে, “মাম্মি, তুমিও কি দু'বার জন্মেছিলে?”

স্নেহের চুমু ফিরিয়ে দিয়ে কোনোরকমে কাপড়টা সামলাতে সামলাতে এলিজাবেথ বলেছিল, "আমি ? আমি একবার জন্মেছি।"

"তাহলে, আমিও বা কেন দু'বার জন্মাব ?" গদাধর মামির গলা জড়িয়ে ধরে ইংরিজীতে বলেছিল।

"ছিঃ, সোনা আমার! তোমার ড্যাডি দু'বার জন্মেছিলেন," এলিজাবেথ বলেছিল।

দুষ্টু ছেলে তবুও বাবাকে মুক্তি দেয়নি। বৎসবকার দিন তিনিও ছেলেকে কিছু বলবেন না ঠিক করেছিলেন। গদাধর মামির কোলে জুতো-পরা অবস্থায় বসে-বসেই জিজ্ঞাসা করেছিল,, "ড্যাডি, প্রথম-বার কোথায় তুমি জন্মেছিলে ?"

"ইণ্ডিয়াতে!"

"সেখানে আমাদের কিং শাসন করেন ?" গদাধর জিজ্ঞাস করেছিল।

দেহের সমস্ত রক্ত সেই মুহূর্তে যেন সমীরণ চ্যাটার্জীর মাথায় উঠে যাচ্ছিল। একবার ভাবলেন, বলেন—'তোমার কিং নয়, তোমার মামাদের কিং। আমরা পরাধীন। ক্রীতদাস। তোমার জ্যাঠামশায় বার্লিনে সিক্রেট-সোসাইটি করেছিলেন। তোমার ঠাকুমা নিজের হাতে চরকা কেটে তার সূতো দিয়ে তৈরী কাপড় পরতেন।'

কিন্তু কিছুই বলতে পারেননি সমীরণ চ্যাটার্জী। হঠাৎ যেন ওঁর মনে হলো এলিজাবেথের চোখ-দুটো ছলছল করছে। চুপ করে রইলেন সমীরণ চ্যাটার্জী।

ওর ননীর মতো সাদা পরিপুষ্ট দাব্না দুটো নাড়তে নাড়তে গদাধর বললে, "আচ্ছা ড্যাডি, দ্বিতীয়বার কোথায় তুমি জন্মেছিলে ?"

"ইণ্ডিয়াতেই," সমীরণ চ্যাটার্জী একটা ছোটো ছেলের কাছেও যেন অপমানিত হচ্ছেন।

"কেন ড্যাডি, একই জায়গাতে তুমি দু'বার কেন জন্মাতে

গেলে ?” গদাধর মার কোল থেকে জোর করে উঠে পড়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

সেইদিনই তাঁর বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু সমীরণ চ্যাটার্জী বুঝতে পারেননি।

বিছানায় শুয়ে এলিজাবেথ বলেছিল, “আমার গা ছুঁয়ে বলো, ওর ওপর তুমি রাগ করোনি। ছোটো ছেলে, ওর কোনো জ্ঞানই হয়নি।”

সমীরণ চ্যাটার্জী বলেছিলেন, “তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, ডার্লিং। তুমি নিশ্চয়ই ওকে ঠিকমতো মানুষ করবে।”

পৈতের ছবিটা আজকের ডাকে আবার বিলেতে পাঠিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে সমীরণ চ্যাটার্জীর। আর একবার ভেবে দেখতে পারবে গদাধর। কিন্তু না। সে-সব পালা চিরদিনের মতো চুকিয়ে এসেছেন তিনি। এখন রাত হয়ে গিয়েছে, অযথা সূর্যের জন্য শোক করে লাভ নেই।

আর কার জন্যই বা তিনি শোক করবেন ? এলিজাবেথ কোথায় ? ভাগ্যবতী মহিলা সে। অনেকদিন আগেই বোধহয় সে বুঝতে পেরেছিল, তাই বলেছিল, “চলো, গডাডারকে নিয়ে আমরা যতো তাড়াতাড়ি পারি দেশে চলে যাই। না হয় আমি ওখানে একটা ইস্কুলে ইংরিজী শেখাবো।”

কিন্তু সাফল্য ? হাতের গোড়ায় যেন ব্যবসার সাফল্য দেখতে পাচ্ছেন সমীরণ চ্যাটার্জী। এতোদিন যখন কাটালেন, তখন আর ক'টা দিন।

সাফল্যের আলেয়ার পিছনে ছুটতে ছুটতে সমীরণ চ্যাটার্জী যে কখন যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বকে লক্ষ্মীর পদতলে নৈবেদ্যরূপে অর্পণ করেছেন বুঝতে পারেননি। কিন্তু কৃপণা লক্ষ্মী তখনও মুখ তুলে চাইলেন না। একনিষ্ঠ পূজারীকে স্ত্রীপুত্র নিয়ে একবার দেশে বেড়িয়ে আসবার সামর্থ্য পর্যন্ত দিলেন না।

ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তের দ্বীপপুঞ্জ তাঁকে অনেক দিয়েছে। আশ্রয়হীন নিঃসম্বল সমীরণ চ্যাটার্জীকে আশ্রয় দিয়েছে, ভাগ্যহীন ক্ষুধার্ত সমীরণ চ্যাটার্জীকে অন্ন দিয়েছে, নিঃসঙ্গ সমীরণ চ্যাটার্জীকে এলিজাবেথের মত স্ত্রী দিয়েছে। কিন্তু অকরুণ অবজ্ঞা, অকুণ্ঠিত অবহেলা, অপ্রতিহত অপমানও তিনি পেয়েছেন অনেক। সে-সব নীরবে সহ্য করেছেন সমীরণ চ্যাটার্জী। শুধু তাই নয়, ভালবাসা পেলেই যে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আবার ইচ্ছে থাকলেই যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া যায় তাও নয়। সমীরণ চ্যাটার্জী তাই দিন গুনছিলেন কবে নিজের দেশে ফিরতে পারবেন। কিন্তু বোধহয় তা আর হলো না।

এলিজাবেথ অবশ্য আশা ছাড়েনি। সে বলেছিল, "আমার মন বলছে, চিরদিন আমাদের এমন অবস্থা থাকবে না। একদিন আমাদের অনেক টাকা হবে। তখন কে আমাদের ইণ্ডিয়াতে যাওয়া ঠেকিয়ে রাখবে?"

সেই এল। তার সব সাঙ্গপাঙ্গ নিয়েই সাফল্য একদিন সমীরণ চ্যাটার্জীর দরজায় এসে নক্ করলো। কিন্তু বড্ড দেরিতে। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। এলিজাবেথের ডাক এসে গেল তার আগে। সে গিয়েছে। যাবার আগেও সে ঝর ঝর করে কেঁদেছে। বলেছে, "আবার দেখা হবে। আর গদাধরকে নিয়ে তুমি দেশে ফিরে যেয়ো। ওকে ঠিক তোমার মনের মতো করে মানুষ কোরো।"

এলিজাবেথ নেই। থাকলে হৈ হৈ করে আজকের আনন্দে সে ভাগ বসাতে পারতো।

কিন্তু গদাধর? ওকে যেন মোটেই বুঝতে পারছিলেন না মিস্টার চ্যাটার্জী। বড়ো হয়েছে সে। হোস্টেলে থেকে কলেজের পড়াও শেষ করেছে সে। এবার ওকে নিয়েই ইণ্ডিয়াতে ফিরবেন সমীরণ চ্যাটার্জী।

এতোদিন ধরে চেষ্টা করে দেশে ফিরে যাবার মতো সামর্থ্য সঞ্চয় করেছেন তিনি।

কিন্তু তারপর? সে-কথা ভাবতেই শিউরে উঠলেন সমীরণ চ্যাটার্জী। দেহের মধ্যটা যেন আবার রিরি করে উঠলো। এই লেখা ছিল তাঁর কপালে!

মিস্টার চ্যাটার্জী সেদিন কেঁদেছিলেন, যেদিন ব্যাঙ্কের পাশ-বই-এর দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন সবাই মিলে ভারতবর্ষে যাবার মতো সামর্থ্য হয়েছে তাঁর। কিন্তু এলিজাবেথ নেই। শ্বশুরবাড়ির দেশে যাবার জন্য সব থেকে যার আগ্রহ ছিল, সে নেই। যৌবনের প্রভাতে যেদিন ওঁদের প্রথম দেখা হয়েছিল, সেদিন থেকে এই অপরাহ্ণ পর্যন্ত অপেক্ষা করেও তার মনের সাধ পূর্ণ হয়নি। কত আশা ছিল তাব। সে বলেছিল, "গদাধবকে কিন্তু তোমাদের জাতের ভালো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবো।"

রসিকতা করে মিস্টার চ্যাটার্জী বলেছিলেন, "কেন?"

"কারণ ইণ্ডিয়ান বউমা হলে 'মাদার-ইন-ল'কে বুড়োবয়সে দেখবে, তার সেবা করবে। সাধে কি আর এই বয়সে আমি গোঁড়া হিন্দু হয়ে যাচ্ছি।"

সমীরণ চ্যাটার্জী হিসেব করে দেখেছিলেন, দেরি হলেও একটা সুবিধে হয়েছে। গদাধরের লেখাপড়া শেষ হয়েছে। বিলেতের ফার্মটা তাঁর ইংরেজ-পার্টনারকে দিয়ে যা টাকা পাবেন, তাতে তাঁদের কোনো চিন্তাই থাকবে না। সেই টাকার অর্ধেক দিয়েই ইণ্ডিয়াতে একটা শাখা খোলা যাবে। কেমিক্যাল টেক্‌নোলজিস্ট গদাধর সেই ব্যবসা দেখবে।

মিস্টার চ্যাটার্জী শুধু মাঝে মাঝে আপিসে যাবেন। আর বাকি সময় ঘোমটা-পরা, এক লজ্জাবিধুরা মেয়ের সেবা উপভোগ করবেন। আরাম-কেদারায় শুয়ে শুয়ে বলবেন, "সে বিরাট গল্প, মা। তুমি তো তোমার শাশুড়ীকে দেখলে না। তাঁর মতো মেয়ে হয় না।"

কিন্তু গদাধর। সারাজীবন ধরে সম্বলহীন অবস্থায় বিদেশে বাস করে সমীরণ চ্যাটার্জী অনেক আঘাত পেয়েছেন ; সে আঘাত সহ্যও করেছেন তিনি। কিন্তু যেখান থেকে কোনোদিন আশা করেননি, সেইখান থেকেই চরম আঘাত এল।

শেষ পরীক্ষা দিয়ে গদাধর বাড়িতে ফিরে এসেছিল। ছেলের কাছে তাঁর বড়ো আনন্দের সিদ্ধান্তটা প্রকাশ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন সমীরণ চ্যাটার্জী।

সেদিন গদাধর কোথাকার এক পার্টিতে গিয়েছিল। কুড়ি-একুশ বছরের ছেলেকে নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা যায় না, মিস্টার চ্যাটার্জী জানেন। সমীরণ চ্যাটার্জী তেমন গোঁড়াও নন। কিন্তু তাঁর সন্তান, তাঁরই অংশে সৃষ্ট সন্তান যে অমন হবে তা বুঝতেই পারেননি।

ওঁদের বাড়ির ব্যালকনি। প্রায় অন্ধকারে, রাত্রের গাউন প'রে একটা বেতের চেয়ারে চুপচাপ বসেছিলেন তিনি। স্মৃতির রোমন্থন অনেকটা চলচ্চিত্রের মতো—অন্ধকার না হলে ছবিগুলো স্পষ্ট হয় না। হঠাৎ গদাধর সেখানে এসে দাঁড়াল। গদাধরকে এবার সুসংবাদটা দেবেন ভাবছিলেন। কিন্তু তার আগেই সে কথা কইল। যেন বলবার জন্য প্রস্তুত হয়েই সে এসেছিল।

"ড্যাডি, তোমাকে একটা সোজা প্রশ্ন করতে চাই," গদাধর ইংরাজীতে বললে।

"ইয়েস, মোস্ট্ সার্টেনলি," সমীরণ চ্যাটার্জী জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে নিজের সন্তানের দিকে তাকিয়েছিলেন।

"মা বেঁচে থাকলে, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করতাম," গদাধর গম্ভীর-ভাবে বলেছিল।

"আমার জন্ম থেকেই তুমি আমাকে ঘৃণা করো, তাই না ?"

সমীরণ চ্যাটার্জীর মুখের উপর কে যেন সপাৎ করে চাবুক মারল ! "হোয়াট ! কী বলছো তুমি ?"

"বলছি, তুমি যদি আমাকে ঘৃণাই করো তবে জন্মের মুহূর্তেই আমাকে টিপে মেরে ফেলোনি কেন?" সমীরণ চ্যাটার্জীর একমাত্র সন্তান বাবার মুখের উপর বলেছিল। "এই শাস্তির চেয়ে সে যে সহস্রগুণ ভালো ছিল।"

"শাস্তি? তোমাকে আমি শাস্তি দিয়েছি!" সমীরণ চ্যাটার্জী আর্তনাদ করে উঠেছিলেন।

"না হলে, পৃথিবীতে কি আর কোনো নাম খুঁজে পেলে না? টম, ডিক, হ্যারি, নোয়েল, ডানিয়েল, ডেসমণ্ড—দুনিয়াতে লাখ লাখ নাম থাকতে—গদাধর! গাডাডর! এমন একটা নাম, যার জন্য প্রতি মুহূর্তে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হয়! প্রতিমুহূর্তে আমাকে মাথা নীচু করে থাকতে হয়, প্রতিমুহূর্তে আপমান সহ্য করতে হয়। লোকে ভয় পেয়ে যায়। মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। আমার চেহারা দেখে তাদের কোনো সন্দেহই হয় না, অথচ নাম শুনলে ভাবে আফ্রিকা বা ঐরকম কোথা থেকে এসেছি। কেন? কেন আমাকে ইচ্ছে করে এইভাবে সকলের থেকে আলাদা করে দিয়েছো? এমন একটা ছাপ দিয়েছো যা সারাজীবন আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে?"

গদাধর! হা ঈশ্বর, গদাধর নাম তাঁর সন্তানের পছন্দ হয়নি। বাবা তার দোষ করেছে।

সমীরণ চ্যাটার্জীর একবার ইচ্ছে হয়েছিল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "But, you are an Indian, তোমার সাদা চামড়ার তলায় ইণ্ডিয়ান রক্তই প্রবাহিত হচ্ছে।"

কিন্তু সাহস হয়নি। যদি সে অস্বীকার করে! যদি সে বলে, "ইণ্ডিয়া! সে আবার কোথায়? আমি তো জানি না। তোমার দেওয়া ঐ বিশ্রী নামটা ছাড়া আমার দেহের আর কোথাও তো ইণ্ডিয়ার ছাপ নেই।"

কোনো কথা বলেননি সমীরণ চ্যাটার্জী। যে মাটির উপর

এতোদিন ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তা যেন একমুহূর্তে ফেটে চৌচির হয়ে গেল, অথচ সর্বংসহাধরিত্রী সীতার মতো তাঁকেও হৃদয়ে গ্রহণ করে সব যন্ত্রণার লাঘব করলেন না।

ছেলেকে বিলেতের ব্যবসার দায়িত্ব দিয়ে, পরের দিনই বোম্বাই-গামী জাহাজের টিকিট কিনেছিলেন সমীরণ চ্যাটার্জী।

যাবার আগে গদাধরকে খামে চিঠি লিখেছিলেন, "তুমি যদি নিজের পছন্দমতো কোনো নাম নিতে চাও, আমি আপত্তি করবো না।"

ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে 'লণ্ডন টাইম্‌স'-এর বিজ্ঞাপনটাও তাঁর নজরে পড়েছিল। "আমি গদাধর চ্যাটার্জী, এতদ্বারা জানাইতেছি যে, ভবিষ্যতে আমার মাতার উপাধি অনুযায়ী আমি জেফ্রি ডানিয়েল স্টোর অথবা জি ডি স্টোর নামে পরিচিত হইব।"

পৃথিবীর কোথাও গোবরডাঙার চ্যাটার্জীদের আর কোনো চিহ্ন রইল না। শুধু জেফ্রি ডানিয়েল স্টোরের পেটে এশিয়ার ম্যাপের মতো কালো অংশটুকু ছাড়া আর কোথাও সমীরণ চ্যাটার্জীর জীবনব্যাপী নির্বুদ্ধিতার কোনো স্বাক্ষর রইল না।

তীব্র যাতনার অনুভূতিতে মনটা তখন ভরে উঠেছিল। কিন্তু এ যন্ত্রণা কিসের? তাঁর জাতীয়তার অপমান? না না, তার সঙ্গে বোধহয় এর কোনো সম্পর্ক নেই। পিতৃত্ব? বাবার দেওয়া নাম সন্তানের পছন্দ হয়নি। হয়তো ···

বেশ ছিলেন সমীরণ চ্যাটার্জী। নিজের অতীতকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে পাহাড় আর দেওদার গাছের মধ্যে লুকিয়ে থেকে জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছেলেন। কিন্তু ব্যর্থ ব্যবসায়ীর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল, একদিন তিনি বিত্তবান ছিলেন, তাঁর সব ছিল। আপন নির্বুদ্ধিতায় জীবনের শেয়ার-মার্কেটে ফাটকাবাজীতে সব হারিয়েছেন। দেউলিয়া হয়ে গিয়েছেন সমীরণ চ্যাটার্জী—তাঁর আপন সন্তান পিতৃপরিচয় অস্বীকার করেছে। উনি বোঝেন এ

অন্যায়, এ তাঁর শোভা পায় না। কেমন করে বুড়ো হতে হয় তা তিনি ভুলে যাচ্ছেন। তবু দেহ মন কোনোটাই তিনি সংযত করতে পারছেন না—তবু তীব্র যন্ত্রণায় দেহটা যেন অস্থির হয়ে উঠেছে।

এই সময় ওরা না এলেই ভালো হতো। কিন্তু সমীরণ চ্যাটার্জী ওদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন। প্রশান্ত হিমানীরা ফিরে আসছে।

সারাদিনের প্রচেষ্টায় পর্বতবিজয়ের আনন্দ ওদের কলহাস্যে মুখরিত হয়ে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু ওরা কথা কইছে না কেন? সমীরণ চ্যাটার্জী দেখলেন প্রশান্ত হাঁপাচ্ছে, হিমানীও গম্ভীর। মুখ রাঙা করে সে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

প্রশান্ত ড্রইংরুমের সোফায় বসে পড়লো।

"কী ব্যাপার? তোমরাও কি বুড়ো হয়ে গেলে? হৈ চৈ করছ না কেন?" সমীবণ চ্যাটার্জী জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রশান্ত বললে, "আজ একটা কেলেঙ্কারী হতো। ও পাহাড় থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছিল। হিমালয় সিং সঙ্গে সঙ্গে ধরে না ফেললে···"

"এ্যাঁ!" মিস্টার চ্যাটার্জী আর্তনাদ করে উঠলেন। "সামনে নিশ্চয় খাদ ছিল?"

"না, তেমন কিছু নয়। একটা আট-দশফুট গর্ত ছিল। কিন্তু সেটা হয়তো আরও দুঃখের ব্যাপার হতো।" আরও কিছু বলতে গিয়ে প্রশান্ত যেন আমতা-আমতা করতে লাগল।

"মানে?"

একটু যেন সঙ্কোচ বোধ করলো প্রশান্ত, তারপর লজ্জা কাটিয়ে গম্ভীর ভাবে বলল, "ও যে চাইল্ড এক্সপেক্ট করছে। জানেন, এতোদিন চেপে রেখে দিয়েছিল, কাউকে বলেনি। ঈগল পাখীর মতো ছোঁ মেরে হিমালয় সিং যখন ওকে ধরে ফেলল, তখন ভয় পেয়ে গিয়ে আমাকে প্রথম বললে। হিমালয় সিং যদি না থাকতো তাহলে কি যে হতো।"

সমীরণ চ্যাটার্জীর একি হলো! তীব্র বিদ্যুতের অকস্মাৎ প্রবাহ যেন ওঁর দেহের মধ্য দিয়ে খেলে গেল। যে লোক হিমানীর খাদে পড়ে যাওয়ার কথা শুনে আঁতকে উঠেছিলেন, তাঁরই মনের মধ্যে হঠাৎ একটা কিম্ভূতকিমাকার চিন্তা বিদ্যুতের মতো চমকে উঠলো। এর মধ্যে তাঁর কোনো হাত ছিল না। হঠাৎ মনে হলো, ঐ ছোট্ট গর্তটার সামনে হিমালয় সিং মেয়েটাকে না ধরলেই ভালো করতো। জীবনজোড়া যন্ত্রণার সম্ভাবনা থেকে ওরা দুজনে একবার অন্ততঃ রক্ষা পেতো। একবার অন্ততঃ ওদের ভুল সংশোধনের সুযোগ পেতো। বিদ্যুতের শক্-এই যেন সমীরণ চ্যাটার্জীর মনে পড়লো সন্তানসম্ভবা এলিজাবেথও একবার দোতলার কাঠের সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, আর কেউ নয় তিনিই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরে ফেলেছিলেন।

নিজের মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরলেন সমীবণ চ্যাটার্জা। একি, এ-সব কী তিনি ভাবছেন? একি! প্রশান্ত কেন ওঁর মুখের দিকে অমন ভাবে তাকিয়ে আছে? ওরা কি ওঁর মনের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছে, ওরা কি বুঝতে পেরেছে?

না না, ওরা বুঝতে পারবে কি করে? আর তা ছাড়া, উনি নিজে তো কিছু ভাবেন নি। বেপরোয়া চিন্তাগুলো গায়ের জোরে ওঁর অনুমতি না নিয়েই মনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ট্রেসপাশার্স—অনধিকার প্রবেশকারী। তারা যদি কারও কথা না শুনে ওঁর সাজানো বাগানে ঢুকে পড়ে, সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়, সার্টেনলি তার জন্য বাগানের মালিককে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু, কিন্তু··· সমীরণ চ্যাটার্জীর মাথাটা ঘুরছে।

ওঁর সর্বাঙ্গে যেন হঠাৎ আগুন ধরে গিয়েছে। পাগলের মতো যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সমীরণ চ্যাটার্জী দ্রুতবেগে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এসে নিজের শোবার ঘরে ঢুকলেন। দড়াম করে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন সমীরণ চ্যাটার্জী।

চোখ বন্ধ করে মাথার চুলগুলো টেনে ধরলেন সমীরণ চ্যাটার্জী। না, ওরা বুঝতে পারেনি। নিজের চোখ দুটো খুললেন সমীরণ চ্যাটার্জী। একি? একি? ছবিটা—দেওয়ালে টাঙানো এলিজাবেথের ছবিটা যেন ওঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। না না, ইমপসিবল্। অসম্ভব। এলিজাবেথ মরে গিয়েছে। সে বেঁচে নেই। বার্মিংহাম এর কবরখানায় তার দেহটা কবে পচে গলে মাটিতে মিশে গিয়েছে।

কেমন যেন ভয় হলো সমীরণ চ্যাটার্জীর। আবার চোখ বন্ধ করলেন তিনি। কিন্তু আবার খুলতে হলো—চোখ বন্ধ করলে এলিজাবেথ যেন আরও কাছে এগিয়ে আসছে। ফ্রেমে বাঁধানো এলিজাবেথ যেন ওঁকে ডাকছে।

ওঁর যেন কোনো ক্ষমতা নেই। কোনো অদৃশ্য চুম্বকের অনিবার্য আকর্ষণে সমীরণ চ্যাটার্জীর লৌহ-দেহটা যেন ছবিটার কাছে এসে দাঁড়ালো। 'মুখ তোলো, মুখ তোলো, আমার দিকে চাও'—সমীরণ চ্যাটার্জীর ভিতর থেকেই কে যেন স্বপ্নাবিষ্ট সমীরণ চ্যাটার্জীকে হুকুম করলো।

মুখ তুললেন, সমীরণ চ্যাটার্জী। এলিজাবেথ ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে। যেন সব বুঝতে পেরে, অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে।

আর পারলেন না, সমীরণ চ্যাটার্জী। নিজের বুকটা দুই হাতে চেপে ধরে, চোখের জলকে বাধা না দিয়ে, সমীরণ চ্যাটার্জী জড়িত কণ্ঠে কোনো রকমে বললেন—বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো, আমি কারুর সন্তানের মৃত্যু কামনা করিনি। আমাকে বিশ্বাস করো!"

॥ তিন-এ নেত্র ॥

রাত্রিতেই খবরটা পাওয়া গিয়েছিল।

আকাশবাণী কর্তৃপক্ষও সংবাদটার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। না হলে, রাত্রের শেষ ইংরিজী খবরে—যেখানে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা, লোকসভার বক্তৃতা, ভূমিকম্প বা রেল-দুর্ঘটনাব মতো মারাত্মক খবর ছাড়া অন্য কিছুই স্থান পায় না—সেখানেও সংবাদটা পরিবেশন করা হয়েছিল কেন?

রাত ন'টাব সংবাদটা শোভনার কানে যাওয়ার কথা নয়। কাবণ শোভনা সাধারণতঃ রোডিও শোনেনা। আর শুনলেও, রাত্রেব ইংরিজী খবরের সময় রেডিও খুলে বাখবার কোনো কথাই ওঠেনা। ন'টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে বেতার মারফত সুদূর দিল্লী থেকে একটা পিঁপ্-পিঁপ্ আওয়াজ ভেসে আসে, শোভনা তখনই সুইচটা বন্ধ করে দেয়। গতরাত্রে কিন্তু রেডিওটা বন্ধ করবার কথা খেয়ালই হয়নি। আসলে ঘরের মধ্যে যে একটা রেডিও চলছে, এ কথা মনেই ছিল না। অবশ্য বেচারা মনটার দোষ কি? একটু আগেই যা কাণ্ড হয়ে গেল।

এক আধ দিন নয়, কত বছর ধরেই বেচারা মনটা দেহের খাঁচায় বন্দী হয়ে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছে। দেহের উপর এতো অত্যাচার হলে কোন্‌কালে সেটা বিকল হয়ে যেতো—বুকের ঘড়িটা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে হঠাৎ কাজে ইস্তফা দিতো। কিন্তু মন? মনটাকে কিছুতেই যে মারা যায় না। যতো শাস্তিই দাও, শুধু যন্ত্রণায় ছটফট করবে; কিন্তু বুকের ঘড়িটার মতো স্প্রিং কেটে গিয়ে বা দম ফুরিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে না।

এসব অবশ্য শোভনার নিজের কথা নয়, অনেকদিন আগে উনিই বলেছিলেন।

বিছানায় শুয়ে মনের পটে অনেকদিন আগের সেই পরিচিত লাইনগুলো লিখে শোভনা পড়ছিল। রেডিওটা খুব মিহি করে খোলা ছিল। ঠিক সেই সময় আওয়াজটা কানে গিয়েছিল।

পাশের ঘরে একটা কাঁচের গেলাস কে যেন আছাড় মেরে ভেঙে ফেললো। শোভনা মুহূর্তের মধ্যে ছুটে গিয়েছিল। সুধাময়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল শোভনা। "এই, কী করছো তুমি?"

শোভনার দেহটাকে সুধাময় এক ঝট্‌কায় পাশে সরিয়ে দিয়ে ছিলেন। সেই দেহ—যে দেহ দেখে সুধাময় একদিন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। যে দেহকে একটিবার দেখবার জন্য গ্রীষ্মকালের সূর্যকে উপেক্ষা করে ছাতা-মাথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় তিনি অপেক্ষা করতেন। আজ সেই দেহটাকেই চোখের সামনে দেখে, কুঞ্চিত মুখে বিরক্ত কণ্ঠে সুধাময় বললেন, "For God's sake, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।"

আলোটা জ্বালাতে যাচ্ছিল শোভনা। সুধাময় বললেন, "খবরদার!"

"কিন্তু কাচগুলো না সরালে, তোমার পা কাটবে।"

"কাটুক।" সুধাময় কাটা উত্তর দিয়েছিলেন।

শোভনার চোখে জল এসে গিয়েছিল। একবার ভাবলে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে, ওকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলে— "ওগো কথা কও! এমন তো তুমি ছিলে না!"

কিন্তু কিছু বলবার আগেই সুধাময় ওর হাতে ধাক্কা দিয়ে বললেন, "বেশী ন্যাকামো করোনা।"

শোভনার মাথাটা ঘুরে উঠলো। মনে হলো তার সামনে একটা মৃতদেহ ম'রে পচে, ফুলে ঢোল হয়ে রয়েছে। সেই পচা দেহটার মধ্যে হাজার হাজার ম্যাগট-পোকা কিলবিল করছে।

সুধাময় আবার চিৎকার করে উঠলেন, "সরে যা, আমার চোখের সামনে থেকে। সরে যা মাগী!"

তারপর আর চুপ করে থাকতে পারেনি শোভনা। নিজের

অপমানিত দেহটাকে টেনে একেবারে সুধাময়ের খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছে সে। শোভনা এখন আর আগেকার মতো তন্বী নেই। নরম মাখনের মতো চামড়াটা আজও রয়েছে! কিন্তু এতো দুঃখের মধ্যেও দেহটা ভারী হয়েছে। বাঙালী ঘরের সকল গৃহিণীর মতো নরম তুলতুলে চেহারাটা।

উত্তেজনায় শোভনার বুকটা দ্রুত ওঠানামা করছিল। তবু সহজ ভাবেই সে বললে, "আজ তুমি অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছো!"

সুধাময় কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে উত্তর দিলেন, "ইডিয়ট!"

তখন শোভনা আর নিজেকে সংযত করতে পারেনি। চাপা গলায়, দাঁতে দাঁত চেপে ওব কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সে কি যেন বললে।

সঙ্গে সঙ্গে যে এমন মন্ত্রের মতো ফল হবে, শোভনা নিজেই ভাবতে পারেনি। ভেবেছিল, সুধাময় এবার হাতের কাছের পেপারওয়েটটা ছুঁড়ে মারবেন। কিন্তু গর্বিত পশুরাজ যেন মন্ত্রগুণে একমুহূর্তে কেঁচোতে পরিণত হলেন।

"কী বললে? শোভনা তুমি কী বললে?" সুধাময়ের সমস্ত মুখটা যেন নীল হয়ে উঠলো।

লজ্জায়, ঘৃণায় নিজের মুখটাকে ঢাকবার জন্য সুধাময় যেন হঠাৎ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এতো লজ্জা যে নিজের অস্তিত্বকে ঢাকবার জন্য টেবিলের ম্লান ল্যাম্পটাও নিভিয়ে দিলেন সুধাময়।

দ্রুত বেরিয়ে এসেছে শোভনা। ফল হয়েছে তাহলে। একেবারে অব্যর্থ পেনিসিলিনের মতো কাজ করেছে, শোভনা হাঁপাতে হাঁপাতে ভাবলো।

সত্যি তাই। চেয়ারের উপর সুধাময় সেই যে স্থির হয়ে বসলেন, আর নড়বার নামটি নেই। ওঁর পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ় কালো দেহটা যেন লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যেতে চাইছে। উঁকি

মেরে শোভনা একবার ওঁকে দেখলো, হয়তো এখনই আবার কি করে বসবেন।

নাঃ, এমন অবস্থায় লোকটাকে দেখলে মায়া হয়। এর থেকে ওঁর দৌরাত্ম্য সহ্য করা অনেক ভালো। সব পৌরুষ, সব শক্তি হারিয়ে, একটা মেরুদণ্ডহীন মানুষ যেন শোভনার পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে। কাটবার আগে কসাইখানার শুয়োরটাকে যেন ডাণ্ডা মেরে অজ্ঞান করে দেওয়া হয়েছে।

এই যে শুয়োরের তুলনা এও শোভনার নিজের নয়। অনেকদিন আগে 'মনের মৃত্যু' পড়েই শোভনা শিখেছিল, সভ্য মানুষদের কসাইখানাতে জবাই-এর আগে শুয়োরদের মাথায় হাতুড়ি মেরে অজ্ঞান করে নেওয়া হয়। ওতে নাকি মাংসের স্বাদ বাড়ে।

শোভনা আর একবার উঁকি মারতে গিয়ে দেখলো, সুধাময় চেয়ার ছেড়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কতক্ষণ বিছানায় শুয়ে শুয়ে শোভনা হাঁপিয়েছিল মনে নেই। রেডিওটা বন্ধ করতেও খেয়াল হয়নি।

ঠিক সেই সময়েই রেডিওতে খবরটা ঘোষণা করা হলো। প্রথমে বিশ্বাসই হতে চায়নি। শোভনা বোধ হয় নামটা শুনতে ভুল করেছে, নিশ্চয়ই অন্য কেউ।

কিন্তু তার একটু পরেই টেলিফোনটা বেজে উঠেছিল। "হ্যালো··· আমি আনন্দবাজার থেকে কথা বলছি···খবরটা নিশ্চয়ই পেয়েছেন।"

শোভনা ধীর সংযত কণ্ঠে বললে, "এইমাত্র রেডিওতে শুনলাম।"

আনন্দবাজারের রিপোর্টার বললে, "ওঁর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চাই।"

"উনি? উনি তো ঘুমিয়ে পড়েছেন।" শোভনা কোনোরকমে উত্তর দিলে।

ওরা অবাক হয়ে গেল। "এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন? ওঁর দু'একটা বক্তব্য পেলে আমাদের পক্ষে লেখবার সুবিধে হতো।"

কাঁদতে ইচ্ছে করছিল শোভনার। কী করে সে বলবে সুধাময় আজ প্রকৃতিস্থ নেই। এখন ডেকে দিলেও তিনি কোনো কথা বুঝতে পারবেন না, কোনো প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারবেন না।

"তা হলে ওঁর সঙ্গে কথা বলবার কোনো উপায়ই নেই? ওদিক থেকে আবার প্রশ্ন এল।

"দেখুন, উনি আজ অসুস্থ। বেশ অসুস্থ, কোনোরকমে একটু ঘুম পাড়িয়েছি।" উত্তর দিতে গিয়ে শোভনার বুকের ভিতরটা যেন দপ দপ করছিল।

কাগজের রিপোর্টার এবার প্রশ্ন করলো, "ওঁর প্রথম রচনা, মনের মৃত্যু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।"

"তারপর?"

"তারপর 'কালি'। ঠিক দু'মাস পরে প্রকাশিত হয়েছিল।" শোভনা ধীরভাবে উত্তর দিয়েছিল।

কাগজের রিপোর্টার অবাক হয়ে গেল। "আশ্চর্য তো, এমনভাবে মনে রেখেছেন!"

নিজের মনেই হাসলো শোভনা। "আর কিছু প্রশ্ন করবেন?"

"না, তার পরে যে-সব লেখা বেরিয়েছে, তা মোটামুটি আমার জানা আছে। আমি নিজেই ওঁর একজন ভক্ত পাঠক।"

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল শোভনা। এখন? এখন কী করবে শোভনা?

হঠাৎ নিজের উপর ঘৃণা ধরলো শোভনার। লোকটা না হয় চিৎকার করছিল, না-হয় শোভনাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিচ্ছিল, কিন্তু সহ্য করলেই পারতো শোভনা। চিরকাল করে এসেছে। হঠাৎ আজই কেন মুখ দিয়ে অমন কথাটা বেরিয়ে গেল।

মুখ বুজে শোভনা যদি বসে থাকতো, এতোক্ষণ সুধাময় তাহলে জেগেই থাকতেন। এবং জেগে থাকলে খবরটা আজ নিজের কানেই শুনতে পেতেন। সমগ্র জাতি আজ তাঁকে সম্মান জানিয়েছে। তাঁর সাহিত্যকর্মের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির সংবাদ সুদূর দিল্লীর রাজধানী থেকে ঘোষিত হয়েছে। শয়নে স্বপনে জাগরণে এতোদিন ধরে উনি যা চেয়ে এসেছেন তাই পেয়েছেন।

গতবছরের কথা মনে পড়ছে শোভনার। ঠিক এমনই দিনে বাংলা-সাহিত্যের আর এক দিক্‌পালের নাম আকাশবাণীতে ঘোষিত হয়েছিল। রাজদ্বারে সম্মান মিলেছে তাঁর। সুধাময় তখন ওঁর কালোরঙের ক্লান্ত-দেহটার চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা লাগিয়ে একমনে লিখছিলেন। নতুন উপন্যাস। মানুষের মনের গহনে যেসব অনাবিষ্কৃত রহস্য গল্পলেখকদের ফাঁকি দিয়ে আজও জমা হয়ে রয়েছে তারই একটা ধরে টান দেবেন তিনি। রহস্যের উপর তিনি তাঁর সম্মোহনী দৃষ্টিপাত করবেন। পোষ-না-মানা উদ্ধত রহস্য তখন অনুগত কুকুরের মতো তাঁর পায়ের তলায় পড়ে লুটোপুটি খাবে। নোতুন রসের সমুদ্রে অবগাহন করে গৌড়জনবাসী ধন্য হবেন।

পুরস্কারের খবর শুনে সুধাময় সেদিন গুম হয়ে বসে ছিলেন। শোভনা প্রথমে বুঝতে পারেনি, ভেবেছিল হয়তো প্লটের বুননটা ঠিক হলো কিনা তাই চোখ বুঁজে হিসেব করে নিচ্ছেন।

চিঠির প্যাডটা এগিয়ে দিয়ে শোভনা তাই বলেছিল, "ওঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা চিঠি লিখবে নিশ্চয় ?"

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন সুধাময়। রচনায় শুদ্ধ বাংলা গদ্যের পক্ষপাতী সুধাময়; কিন্তু উত্তেজিত হলে কথাবার্তায় অযথা ইংরিজী মেশাতে আরম্ভ করেন তিনি।

চিৎকার করে উঠেছিলেন সুধাময়, "What ! অভিনন্দন জানাতে হবে ঐ লোকটাকে ? হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কে ? ও আবার লেখক হলো কবে ? জীবনের কোনো সমস্যার কথা চিন্তা করেছে কোনোদিন ?

চিন্তা করবেই বা কোথা থেকে ? হার্ট-বলে কোনো বস্তু ওর পাঁজরের মধ্যে আছে ? আর যদিও ওখানে তেমন কিছু থাকে সেটা প্লাস্টিকের তৈরি, রক্ত মাংসের নয়।" সুধাময় হা-হা করে হেসে ফেলেছিলেন।

অবাক হয়ে গিয়েছিল শোভনা। এই সুধাময়ই তো একদিন হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকতেন। সেসব দিনের কথা এঁরা একেবারেই ভুলে গিয়েছেন। লেখকরা কিছুই মনে রাখতে পারেন না।

রাত্রি বাড়ছে। আর শোভনার মন যেন এই বিষণ্ন নীরবতা আর সহ্য করতে পারছে না।

এখনই গিয়ে ওঁকে জাগিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। সুধাময়ের এতোবড়ো সুসংবাদ ওঁর বিছানায় বসে আস্তে আস্তে শোভনার-ই বলা উচিত ছিল। কিন্তু শোভনার সে-সাহস নেই। অনেক কষ্টে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছেন আজ সুধাময়।

ভয় লাগছে ? নিজের স্বামীকে জাগিয়ে তুলে একটা সুসংবাদ দিতে স্ত্রীর সাহস হচ্ছে না। এমন হবে, সে কথা কি অনেকদিন আগে, যেদিন ওদের মধ্যে প্রথম দেখা হয়েছিল, শোভনা জানতো !

ধীরে ধীরে শোভনা যেন পুরনো স্মৃতির জড়ানো রীলগুলো খুলতে আরম্ভ করলো। আজকের কথা নয় সে-সব। অনেক-দিনের অবহেলায় এবং অযত্নে সেই-সব স্মৃতির উপর সামান্য ধুলো পড়েছে, কিন্তু শোভনা জানে একটু যত্ন করলেই, একটু মুছে নিলেই তারা আবার নোতুনের মতো ঝকঝক করে উঠবে।

যারা গল্প লেখে, মানুষের মন নিয়ে নাড়াচাড়া করে তাদের সম্বন্ধে সেদিন কী আশ্চর্য ধারণাই না ছিল শোভনার। সেদিনের শোভনাকে আজকের শোভনা যেন অ্যালবামের মধ্যে যত্ন করে-রাখা ছবির মতো দেখতে পাচ্ছে।

হোস্টেলের মেয়েরা শোভনা ব্যানার্জী বলে ডাকতো। শোভনা প্রতিবাদ করতো। বলতো, "আমি ব্যানার্জী নই, আমি বন্দ্যো-পাধ্যায়।" চলনে বলনে ইংরিজীয়ানা ওর একদম পছন্দ হতো না। ওর সহজ বাঙালীয়ানাকে অন্য মেয়েরা অনুসরণ না করলেও, মনে মনে সম্ভ্রম করতো।

আর ওর রূপ? ওর খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ারের মতো তীক্ষ্ণ তনুদেহ, ডাগর ডাগর চোখ, নম্র কচি মুখ, রেশমচিকন চুল নজরে পড়লেই অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বেশ শক্ত ব্যাপার।

বন্ধুরা বোধ হয় একটু বাড়িয়েই আলোচনা করতো। ওরা বলতো, উর্বশীকন্যা শকুন্তলা কণ্বের আশ্রম ত্যাগ ক'রে লেডী এজ্‌রা হোস্টেলে এসে উঠেছে। কিন্তু সে রূপটা এমন কিছু অসাধারণ ছিল না, শোভনার মনে হলো। রূপ নিয়ে কোনোদিনই সে মাথা ঘামায়নি। হঠাৎ আজ মনে হলো, ঘামালে মন্দ হতো কী?

বুকের আঁচলটা একটু সরিয়ে নিজের বাঁ-হাতের দিকে একবার তাকালো শোভনা। সংসারের আগুনে পুড়ে রংটা অনেক মলিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যা আছে, তাতেই বোঝা যায় অনেকদিন আগের থার্ড-ইয়ার বাংলা-অনার্সের ছাত্রী শোভনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী ছিল।

কলেজের ছেলেরা ওর সামনে কোনোদিন কিছু বলেনি, বরং ওকে সমীহ করেই কথা বলতো। অথচ সহপাঠিনীরা বলতো, ছেলেরা নাকি অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

ওদেরই মধ্যে কে যেন শোভনাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিল। বান্ধবীরা কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছিল। হোস্টেলে ডাইনিং রুমে চা খাবার সময় নিজেরা হেসে শোভনাকে হাসাবার চেষ্টা করেছিল। শোভনার গাম্ভীর্যের আবরণ কিন্তু ভেঙ্গে যায়নি। কবিতা ওর ভালো লাগে, কিন্তু তা ব'লে কবিতার শুভ্র পবিত্রতা যারা ইচ্ছে করে নষ্ট করে তাদের সে পছন্দ করে না।

এক দুই তিন

শোভনার ভালো লাগত সাহিত্য। লেখা আর লেখককে কেন্দ্র করেই সে নিজের স্বপ্ন গড়ে তুলেছিল।

আজ কিন্তু হাসি আসছে শোভনার। ভাবতে আশ্চর্য লাগে অষ্টাদশী মনটা তখন কতো সহজেই অবাক হয়ে যেতো। একটা গল্প প'ড়ে কতোক্ষণ উদাস হয়ে বসে থাকতো, আর ভাবতো কেমন করে এমন লেখা কলম দিয়ে বেরিয়ে আসে।

সুমিতা সান্যাল ওর ঘরেই থাকতো। তারও গল্পের বই পড়তে ভালো লাগতো। সুমিতাকে শোভনা জিজ্ঞেস করতো, "এ-গল্প যিনি লিখেছেন, তিনি কেমন দেখতে বল তো?"

সুমিতা বলতো, "সে কি করে বলবো ভাই? গল্প পড়তে ভালো লাগে তাই পড়ি। কিন্তু তারপর ও-নিয়ে মাথা ঘামাই না।"

শোভনা কষ্ট পেয়েছিল। বলেছিল, "কিন্তু এই গল্পটা লিখতে লেখক কতো চিন্তা করেছেন ভাব তো? কি সুন্দর পরিকল্পনা। ছোট একটা সূর্যমুখী ফুলের গাছ, আর ঘরের-ভিতরে-বসা বধূটি। প্রথম সন্তানকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে এসেছে।"

সুমিতা বলেছে, "তাতে হয়েছে কি?"

"বা রে, তারপর কেমন করে ঐ সন্তানহারা যুবতী-বধূর চোখে পৃথিবীর রং পালটিয়ে গেল। নিশ্চয়ই নিজের চোখে দেখেছেন লেখক। হয়তো ওঁর নিজের স্ত্রীর কথাই লিখেছেন।"

সুমিতা বলেছে, "দূর, তোর যেমন বুদ্ধি! যারা লেখক তারা সব-কিছু বানিয়ে নিতে পারে।"

"সত্যি?" শোভনা আরো আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে।

সুমিতা বলেছে, "ইচ্ছে করলে তুইও তো লিখতে পারিস। সেবার যখন অসুখের জন্য আমাকে বাড়ি চলে যেতে হলো, তখন যে চিঠিগুলো তুই লিখতিস, ভারি সুন্দর সেগুলো। পড়তে পড়তে কতদিন আমার চোখে জল এসে যেতো।"

"কিন্তু সে-সব আমার নিজের কথা নয় তো। সবই তো কোটেশন। কবিতা গল্প, উপন্যাস থেকে যে-সব কথাগুলো আমার ভালো লাগে সেগুলো নোট-বইতে লিখে রেখে দিই।" একটু থেমে বিষণ্ণভাবে শোভনা বলেছিল, "ওসব কথাগুলো কত সুন্দর। কিন্তু নিজের কথা লাগাতে গেলেই, সুর কেটে যায়। কানে কেমন কর্কশ শোনায়।"

শোভনার আর কিছু ভালো লাগতো না। ওর কণ্ঠে সুর আছে, ইচ্ছে করলেই গান গাইতে পারে। সঙ্গীত তাই ওকে আশ্চর্য করে না। দেহে রূপ আছে, স্নিগ্ধতা আছে, মাধুর্য আছে—তাই পৃথিবী কত অসুন্দর, কত তিক্ত, কত কঠিন, তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না।

কিন্তু লেখক? ওদের কাউকে যে দেখেনি সে। শুনেছে বড়ো উদাসী আর খামখেয়ালী হয় ওরা। নিজের আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে মারতে পারলে, ওরা নাকি আর কিছুই চায়না। ওরা যদি আত্মঘাতী না হতো, ধূপের মতো তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে গন্ধ বিতরণ না করতো, বাণীর দেউল তাহলে আরও কত সমৃদ্ধ হতো, পৃথিবী আরও কত সুন্দর হতো।

শোভনা চেষ্টা করেছে। খাতা কলম নিয়ে বসে মনের কথাগুলো হৃদয়ের প্রেম দিয়ে রঙীন করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি। কলম দিয়ে যা বেয়িয়েছে, তা ঠিক মনের মতন হয়নি— যাঁরা লেখেন তাঁদের মতো সুন্দর হয়নি। অথচ শোভনার কলমে ভাষা বেরিয়ে আসতে কার্পণ্য করে না, তার সুরও হয়তো আছে, শুধু সেই যাদুস্পর্শ নেই, যার প্রভাবে সামান্য তুলির টান হঠাৎ ছবি হয়ে ওঠে, কলমের অর্থহীন আঁচড় রূপ নেয় কাব্যে।

এ-নিয়ে মিছিমিছি কেন যে অতো ভাবতো শোভনা! যৌবনের সেই প্রাণমাতানো দিনগুলোর অনেক অংশ—অনেক মুহূর্ত, মিনিট ও ঘণ্টা—এইসব অর্থহীন ভাবনা, এবং অহেতুক বিস্ময়ে সে নষ্ট করেছে। অন্ততঃ আজ তাই মনে হচ্ছে।

কিন্তু সেদিন? সেদিন লেখা আর লেখকের কথা ভাবতেই সর্ব

শরীরে যেন শিহরণ দেখা দিত। অবশ্য আর সব কিছুও ঠিক চলছিল। এরই মধ্যে নিজের ক্লাসের পড়াশুনা, বান্ধবীদের সঙ্গে হৈ-হৈ করে হোস্টেলের হল্‌ঘরে টেবিল-টেনিস খেলা। পিঙ-পঙের ব্যাট ধরে লাফালাফি নাচানাচির মধ্যে সৌন্দর্য না থাক, জীবনের গভীরতব সমস্যাগুলোকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকবার অবকাশ ছিল।

সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে। বেশ কিছুক্ষণ টেবিল-টেনিস খেলে ঘামে যখন ব্লাউজটা ভিজে উঠেছিল, তখন একটু বিশ্রামের জন্য হলঘরের কোণে একটা চেয়ারে শোভনা বসে পড়েছিল। সামনের টেবিলেই বাংলা-ইংরাজী মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক কাগজগুলো পড়েছিল। ক্লান্ত দেহে পত্রিকার সারি থেকে 'প্রবাসী' খানা আপন মনেই তুলে নিয়েছিল শোভনা।

পাতা উলটোতে গিয়ে প্রথমেই যেখানে নজর পড়ল, সেইখানেই চোখটা আটকে গেল। গল্প। নামটা অদ্ভুত মনে হয়েছিল তখন—'মনের মৃত্যু'।

রুমালে মুখ ও ঘাড়ের ঘামটা মুছে নিয়ে, গল্পটা পড়তে আরম্ভ করেছিল শোভনা এবং পড়তে পড়তে এক আশ্চর্য অপরিচিত জগতে ঢুকে পড়েছিল। বিচিত্র এক অনুভূতি মনটাকে যেন ক্রমশঃ অবশ করে দিচ্ছিল। এক হতভাগ্য, অথচ কল্পনাপ্রবণ যুবকের কাহিনী। সংসারের নানা আঘাতে দেহ পরাভূত হয়, নত মস্তকে, করজোড়ে সে বিজয়ী শত্রুর চরণে আত্মসমর্পণ করে। বলদর্পী পৃথিবীর অস্ত্রাঘাতে দেহের পরাজয় হয়, মৃত্যু হয়। কিন্তু মনের? মনের কি মৃত্যু হয়? না, মনের মৃত্যু নেই। 'মনের মৃত্যু'র লেখক ঘোষণা করেছেন, আত্মঘাতী না হলে মনকে কেউ মারতে পারে না। বেচারা দেবিদাস আর বনলতা। ওরা তো চেয়েছিল দুজনে দুজনকে ভালবাসতে—হাতে হাত মিলিয়ে যুগল তেজে সবল ভাগ্যকে জয় করতে। কিন্তু চরম সাফল্যের মুহূর্তে নিষ্করুণ পৃথিবী এসে দাঁড়িয়েছিল চলার পথের মাঝখানে, ওদের মিলনের অন্তরায়

হয়ে। তারপর···অবাক হয়ে গিয়েছিল শোভনা। লেখক মুহূর্তের মধ্যে ওদের দুজনের জন্য আর এক বিশ্ব সৃষ্টি করলেন—দেবিদাস ও বনলতা সেই বিশ্বে পরস্পরকে হত্যা করতে চাইল। কণ্ঠরোধ ক'রে, বা বিষ প্রয়োগে দেহের হত্যা নয়—ওরা মনকে মারতে চাইল।

কতক্ষণ এই ভাবে গল্পটা পড়েছিল খেয়াল নেই। সুদীর্ঘ গল্পটা শেষ করে শোভনা যখন সম্বিৎ ফিরে পেল তখন দেহের ঘাম শুকিয়ে গিয়েছে, টেবিল-টেনিসের স্মৃতি মন থেকে ধুয়ে মুছে বেরিয়ে গিয়েছে, তখন কেবল লেখকের শেষ কটি লাইন চোখের সামনে জ্বলছে আর নিবছে—'মনের মৃত্যু নেই। মনকে কেউ মারতে পারে না। যে পারে তার নামও মন, ইচ্ছে করলেই সে মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে জ্বালিয়ে ফিউজ করে দিতে পারে।'

রিডিং-রুমের বাইরে কাগজ নিয়ে যাবার নিয়ম নেই। কিন্তু শোভনার মতো শান্ত নরম মেয়েও সেদিন নিয়ম মানতে পারল না। ঘরে কেউ ছিল না। চারিদিকে একবার সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রঙীন শাড়ির আঁচলের মধ্যে পত্রিকাখানা লুকিয়ে ফেলেছিল সে।

নিজের ঘরে এসে বালিশটাকে বুকের কাছে দিয়ে, বিছানার উপর উবুড় হয়ে শুয়ে, শোভনা গল্পটা আবার পড়েছিল। তবু যেন মন ভরলো না। পাতলা চাদরটাকে বুক পর্যন্ত টেনে দিয়ে চিৎ হয়ে গল্পটা আবার পড়লে। অকারণ বিষণ্ণতায় মনের সরোবর যেন টলমল করতে লাগল।

লেখকের নামটাও বার বার পড়েছিল শোভনা। তারপরই কেমন যেন জানতে ইচ্ছে করলো, লোকটা কেমন। বয়স কত? জীবনকে কেমন করে এমন ভাবে দেখলেন, এতো ভালবাসলেন? কতদিন ধরে খুঁজে খুঁজে মনের গহনে যে-সব কথা লুকিয়ে থাকে তাদের আবিষ্কার করলেন, এবং খনির অন্ধকার থেকে তাদের সবলে পৃথিবীর আলোকের মধ্যে তুলে আনলেন।

শোভনা কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়েছিল। সুমিত্রা কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কাকে চিঠি লিখছিস?"

লজ্জা পেয়ে শোভনা কাগজটা আঁচল চাপা দিয়েছিল। কিন্তু তাতে ফল ভালো হলো না। সুমিতা এমন একটা বিশ্রী ধরনের সন্দেহ করে বসলো, যা ভাবতেও শোভনার গা ঘিন-ঘিন করে উঠেছিল।

সুমিতা প্রশ্ন করেছিল, "ভাগ্যবানটি কে?"

শোভনা উত্তর দেয়নি।

সুমিতাও নাছোড়বান্দা। "নিরুপম সান্যাল নাকি?"

ভাবতেও বিশ্রী লেগেছিল শোভনার। মোটা কাঁচের চশমাওয়ালা, কোঁকড়া-চুলের ঐ ছেলেটাকে অনেক মেয়েই মনে মনে পছন্দ করে। ওর দেহে সৌন্দর্য আছে সত্য কথা; কিন্তু মনে কোনো গভীরতা নেই। দিনরাত সিগারেট খেয়ে, পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। কিন্তু আধুনিক যুগের যা ধর্ম, লেখাপড়ায় খারাপ নয়। সিনেমাও দেখে, সিগারেটও খায়, দুষ্টুমিও করে, আবার পড়া-শোনাটাও ওরই মধ্যে ম্যানেজ করে! কিন্তু শোভনা দেখেই বুঝতে পারে—একেবারে অগভীর। গাদা-গাদা সস্তা আমেরিকান ডিটেকটিভ নভেল প'ড়ে নিজের মূল্যবান সময়টা যে নষ্ট করে, তার মনের গভীরতা কতটুকু থাকতে পারে?

গুজবটা কানে গিয়েছিল শোভনার। সব মেয়েদের বাদ দিয়ে নিরুপমের নজর পড়েছিল শোভনার উপর। অথচ শোভনা কখনও ওকে আমল দেয়নি। কিন্তু ছেলেটা এত অসভ্য যে, প্রত্যাখ্যাত হয়েও আশা ছাড়েনি। ওর নামে কবিতা লিখে ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে নাকি বিলিও করেছিল।

সুমিতাই কোথা থেকে একটা কপি যোগাড় করে মেয়েদের কমনরুমে ওকে আড়ালে ডেকে শুনিয়েছিল:

রূপবতী শোভনার আপেল-গণ্ডের তরে
বহু কবি হয়েছে ভ্রমর,

এক দুই তিন

অপরূপ কবিতায় রক্তিম গণ্ডেরে
তারা করেছে অমর।

তারপর আরও অনেকগুলো লাইন ছিল। কিন্তু শোভনার শোনবার ধৈর্য হয়নি। সুমিতার হাত থেকে কবিতাটা ছিনিয়ে নিয়ে সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিল।

আর সুমিতাটা বলে কি? ও কিনা সন্দেহ করলে, নিরুপমকে চিঠি লিখছে শোভনা!

এতোদিন পরে চিঠি লেখার কথায় নিরুপম সান্যালের মুখটা শোভনার আবার মনে পড়লো। আধুনিক কোলকাতার ছোকরা বলতে যা বোঝায় নিরুপম সান্যাল তাই ছিল। নন্দন রোড না ওই ধরনের কোথায় থাকতো। তখন মনে হয়েছিল, টিপিকাল নগর-সভ্যতার উৎপাদন। মস্তিষ্ক আছে, কামনা আছে, কিন্তু আত্মা নেই।

সেই নিরুপমের সঙ্গেই তো কিছুদিন আগে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ওঁর সঙ্গে শোভনা সেবারে বর্ধমানে গিয়েছিল। বর্ধমান সাহিত্য-সংঘের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা করতে। বিষয় ছিল—জীবন ও সাহিত্য। সভাতেই নিরুপমের সঙ্গে দেখা হলো।

এস্. পি. হয়েছে নিরুপম। পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। একেবারে অন্যমানুষ। সেদিনের চপলতা দুষ্টুমি সব কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

নিরুপম সান্যালের ডলপুতুলের মতো সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ হলো। ওদের দু'জনকে পরিচিত করে দিয়ে নিরুপম সান্যাল ডায়াসের দিকে এগিয়ে গেল।

নিরুপমের স্ত্রীর কাছে অবাক হয়ে শোভনা শুনলো—"উনি এখন এতো কাজের মধ্যেও প্রতি শনিবার রামকৃষ্ণ-মিশনে যান। রোজ সকালে আধঘণ্টা গীতা পাঠ করেন। তারপর কাজের মধ্যে ডুবে যান। এখন উনি যেখানে পোস্টেড সেখানে শুধু লেবার-

আনরেস্ট নয়, স্টুডেন্ট-ইনডিসিপ্লিন-ও রয়েছে। কো-এডুকেশন কলেজ, ছেলেদের অসভ্যতা, চিঠি ছোড়াছুড়ি লেগেই আছে।”

শোভনার একবার লোভ হয়েছিল। ইচ্ছে হয়েছিল মিসেস সান্যালকে জিজ্ঞাসা করে—“আপনার স্বামীও একদিন মেয়েদেব নামে কবিতা লিখতেন, জানেন কী ?”

কিন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় নি। তার আগেই মাইকে ঘোষণা করা হয়েছিল—“জীবনকে আমরা সকলেই দেখছি। কিন্তু সাহিত্যিক যে-দৃষ্টিতে জীবনকে দেখেন, জীবনের বেদীমূলে যেভাবে আপনার অর্ঘ্য নিবেদন করেন, তার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে সুধাময়বাবুর মতো জীবনদ্রষ্টাকে আজ আমাদের মধ্যে পেয়েছি।...”

আজ হয়তো শোভনার হাসি আসছে। হয়তো অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ে পৃথিবীকে বলতে ইচ্ছে করছে—“মিথ্যা...মিথ্যা...জীবনকে দেখা অত সহজ! বানিয়ে বানিয়ে যারা গল্প খাড়া করতে পারে, নিজের কল্পনা থেকে একটা মেয়ে, আর একটা ছেলেকে সৃষ্টি করে তোমাকে কয়েকঘণ্টা আনন্দ দিতে পারে, জীবনকে দেখবার একচেটিয়া অধিকার তাদেরই ? হাউ ফানি! How foolish!”

কিন্তু সেদিন ? যেদিন সুমিতা জোর করে ওব হাতদুটো চেপে ধরে লেখার প্যাডটা ছিনিয়ে নিয়েছিল, তখন ?

সুমিতা বলেছিল “একটা গল্প পড়েই এমন অবাক হয়ে গেলি ?”

শোভনা তখন আর লজ্জা পায়নি। ও জানতো সুমিতার সে অনুভূতি নেই। লেখা ভালো-লাগার যে কী আনন্দ সে ও বুঝবে কী করে ?

শোভনা চিঠিতে তার হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। আরও লিখেছিল—“হয়তো এই সামান্য পাঠিকা আপনার অমূল্য সময়ের কিছু নষ্ট করলো। কিন্তু আমার অভিনন্দনটুকু আপনাকে না জানানো পর্যন্ত কিছুতেই শান্ত হতে পারছি না। জানি অভিনন্দনের

যে বৈচিত্র্যময় স্তূপ এখন থেকে আপনার পদতলে প্রতিদিন জমা হবে, সেখানে আমার মতো একজন সামান্য পাঠিকার শুভেচ্ছার কোনো মূল্যই থাকবে না। কিন্তু আমার কর্তব্য সম্পন্ন করে, এবার হৃদয়ের সামনে নির্ভয়ে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবো।”

এইখানেই শেষ করেনি শোভনা। সে আরও লিখেছিল—“আপনার করুণ কাহিনীতে পৃথিবীর মানুষদের অনেক দুঃখ দিয়েছেন। তাদের শাস্তি দেবার অধিকার আপনার আছে, কারণ আপনি ভালো লিখেছেন এবং পাঠকের মনের খবরও আপনি রাখেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তাদের একটু আশা, একটু আনন্দ উপহার দিতে দোষ কি।”

চিঠিটা ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে শোভনা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়েছিল। ভেবেছিল এইখানেই সব শেষ হলো। কারণ নিজের মনের কথা লিখলেও, শোভনার ভয় ছিল, লেখক নিশ্চয় কাঁচা-মনের চিঠি পেয়ে হেসে উঠবেন, তারপরে অবজ্ঞাভরে ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়ির মধ্যে চিঠিটাকে দুমড়ে গোল্লা পাকিয়ে ফেলে দিয়ে নিজের সৃষ্টির সাধনায় আবার মগ্ন হবেন। সেই অবজ্ঞা হয়তো তার মতো সামান্য পাঠিকার প্রাপ্য, কিন্তু তবুও তাকে গ্রহণ করবার মতো শক্তি নেই তার ; এবং সেইজন্যই শোভনা অবজ্ঞার সম্ভাবনাকে সমূলে বিনাশ করে দিয়েছিল। চিঠির উপরে নিজের ঠিকানা লেখেনি।

চিঠিটা লেখার পর শোভনার মনটা যেন আরও বিষন্ন হয়ে গিয়েছিল। ছেলেমানুষের মতো ওর হিংসে করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ওর রূপ, ওর যৌবন, ওর পরিবেশ, ওর বয়স সব যেন মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল। এ-সবের পরিবর্তে ঈশ্বর ওকে কেন সেই শক্তি দিলেন না, যা দিয়ে সাহিত্যের কমলবনে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

সেই রাত্রে শোভনা যে নিজের উপর অবিচার করেছিল, তা অনেকদিন পরে আজ রাত্রে যেন শোভনা বুঝতে পারলো। সেদিন নিজের দৈন্যকে অহেতুক বড়ো করে দেখে সে অন্তরাত্মাকে অপমান করেছিল। আজ কোনো খেদ নেই শোভনার। পৃথিবীর অনেক

মানুষ লেখেনি, নাটক-নভেলের সিঁদ কেটে মনের অন্দরমহলে গিয়ে হাজির হয়নি, কিন্তু সেইজন্যই তাদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়নি। তাদের সুখশান্তিরও কোনো অভাব হচ্ছে না। তাদের নাম হয়তো কাগজের পাতায় ছাপা হয় না, রেডিওতে তাদের কোনো সংবাদ হয়তো ঘোষণা করা হয়না, ট্রামে-বাসে, রেস্টুরেন্টে, কলেজের কমন-রুমে, লাইব্রেরীতে তাদের নিয়ে হয়তো কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু তা ব'লে, কি তারা সুখে নেই? ভাগ্যের রথচক্র হয়তো তাদের অনেককে চাপা দিয়েছে, তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে হয়তো গোঙাচ্ছে, হয়তো ভেঙে পড়ছে; কিন্তু এমন ভাবে কেউ তো নিজের আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে মারছে না। তাও যদি চিতার লেলিহান আগুন হতো, তেমন দুঃখের কিছু থাকতো না; অগ্নিশিখা কিছুক্ষণের মধ্যেই সব গ্রাস করে নিতো। কিন্তু এ যে টিকের আগুনের মতো। নিজের আগুনে মনটাকে যেন শিকের মধ্যে পুরে কাবাব বানানো হচ্ছে।

আজ যদি সুধাময় ঘুম থেকে হঠাৎ উঠে পড়ে শোভনাকে খোঁজেন, কাছে ডাকেন, শোভনার যেতে ইচ্ছে করবে না। শোভনা এমন ভাব করবে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, ওঁর ডাক কানে এসে পৌঁছয়নি।

অথচ হোস্টেলের সেই দিনটা? যেদিন নতুন মাসের কাগজটা রিডিংরুমে এল। সুধাময়ের নতুন লেখা বেরিয়েছে। একি! শোভনার বিশ্বাস হয়নি। গল্পের আরম্ভ—

সুচরিতাসু, আপনার চিঠি পেয়েছি। অপরিচয়ের অবগুণ্ঠন থেকে আমাকে শরাঘাত করেছেন; সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও আমার পক্ষে উত্তর দেবার উপায় নেই। বিশ্বাস করুন, আমি এই পৃথিবী, এই মানুষ, মাটি—সব-কিছুকেই ভালবাসি। এবং ভালবাসি বলেই অভিযোগ জানাতে দ্বিধা করিনা। কিন্তু তবু আপনি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছেন! কোনো অভিযোগ না করেই আজ একটা গল্প লিখবো ঠিক করেছি!…

এমন উত্তেজনা শোভনা কোনোদিনই অনুভব করেনি।

শোভনার ঠোঁট-দুটো কাঁপছে। হাত-দুটো ঘামে পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। "শিল্পীর মনে আমি নাড়া দিয়েছি। মৃদুমন্দ বাতাসেই বিশাল বনস্পতি দুলতে শুরু করেছে। কী আশ্চর্য!"

শোভনা আরও আশ্চর্য হয়েছিল যেদিন সুধাময়ের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হলো। ঠিকানা জানিয়ে তার অনেক আগেই শোভনা চিঠি লিখেছিল। সুধাময় উত্তর দিয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে শোভনা আবার চিঠি পাঠিয়েছিল। সাহস বেড়ে গিয়েছিল শোভনার, সুধাময়কে সে হোস্টেলে আসবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল। পোস্টকার্ডে সুধাময় উত্তর দিয়েছিলেন, অমুক দিন, অমুক সময় দেখা করতে যাচ্ছি।

আপন কল্পনায় শোভনা ইতিমধ্যেই 'মনের মৃত্যু'র লেখক সম্বন্ধে একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি এঁকে ফেলেছিল। ভেবেছিল চুলগুলো বড়ো বড়ো হবে; আর চোখ-দুটো হবে টানা-টানা। কিন্তু সুধাময় যখন সশরীরে আবির্ভূত হলেন তখন দেখা গেল কিছুই মেলেনি। সুধাময়ের অতি সাধারণ বাঙালী ছাঁট দেখে শোভনার মনে হলো, তাই তো তার নিজেরই ভুল হয়েছিল, আধুনিক যুগের লেখকেরা কেন বড়ো বড়ো চুল রাখবেন? কল্পনার সঙ্গে না মিললেও লোকসান হয়নি। চোখ-দুটো টানা-টানা নয় বটে, কিন্তু ঠিক যেন দুটো বড়ো বড়ো হীরে, উজ্জ্বল বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল করছে।

হোস্টেলের ভিজিটরস-রুমে সুধাময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শোভনা কথা বলতে পারলো না। শুধু সুধাময়ের পাঞ্জাবি-পরা উস্কোখুস্কো চুল-ওয়ালা শ্যামবর্ণের দেহটার দিকে সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

'মনের মৃত্যু'তে উনি দেবিদাসের যে চুলের বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। উনি লিখেছেন—"ওর চোখ ওর দেহ, ওর বাচনভঙ্গী কোনো কিছুতেই ওর মনের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েনি। কিন্তু চুলগুলোর কথা স্বতন্ত্র, ওরা জানে, ওরা যেখান থেকে

বেরিয়েছে তারই সামান্য গভীরে কী সর্বনাশা আগ্নেয়গিরিটি রয়েছে। তাই ওরা উদ্ধত এবং বেপরোয়া—চিরুনির শাসনে সারিবদ্ধ ভেড়ার মত নিশ্চল না হয়ে থেকে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বিদ্রোহের জয়পতাকা ওড়াচ্ছে। কিন্তু কার বিরুদ্ধে অভিযোগ, কার বিরুদ্ধে অভিযান তা জানা নেই বলেই, আছে শুধু অশ্লীল বিশৃঙ্খলতা।"

শোভনার নীরবতা বোধ হয় আর ভালো দেখাচ্ছিল না। শোভনা বললে, "আপনি যে আসবেন, আমি ভাবতেই পারিনি।"

সুধাময় হেসে ফেলেছিলেন। ওঁর হাসির মধ্যে একটা সর্বনাশা মাদকতা আছে। মনে হয় যেন কতদূরে, কোনো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছেন তিনি। সেইখান থেকে এক্স-রে চোখে তোমার মনের ভিতরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, তারপর উনি হেসে ফেলছেন। তোমার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী, তোমার প্রতিটি চাহনির অর্থ যেন ওঁর কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে। কোনো কিছুই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে লাভ নেই।

সুধাময় বলেছিলেন, "আমি যদি পাঠকদের শাস্তি দিয়ে থাকি, তাহলে আপনিও আমাকে অনেক শাস্তি দিয়েছেন। আপনার সেই চিঠিটা আমাকে এখনও ভাবাচ্ছে। হয়তো এতোদিন ধরে যেভাবে চিন্তা করে এসেছি, সেই পথ আমাকে পরিত্যাগ করতে হবে।"

শোভনা জিজ্ঞাসা করেছিল, "একটা কথা বলবো? হয়তো আমার অজ্ঞতা—"

সুধাময় সাহস দিয়েছিলেন: "বলুন।"

"মনের মৃত্যুতে দেবিদাসের চুলের কথা বলতে গিয়ে আপনি লিখেছেন অশ্লীল বিশৃঙ্খলতা। এটা কী করে হয়?"

সুধাময় গম্ভীর ভাবে বললেন, "আপনারা হয়তো ভাবছেন, ওটা একটা আধুনিক সাহিত্যের স্টাণ্ট। তা নয়। বিশ্বাস করুন, জীবনের সব বিশৃঙ্খলতাই আমার কাছে অশ্লীল। আমার গা-টা কেমন যেন ঘিন-ঘিন করে ওঠে। আমার লেখাতেও তাই দেখবেন, আমার চিন্তার শৃঙ্খলা আছে। যখন আমি লিখি, লাইনগুলো যদি সোজা

হয়, তবে আমি বুঝতে পারি ভালো লিখছি। যেদিন দেখি লাইন-গুলো সমান্তরাল হচ্ছে না, তখনই লেখা বন্ধ করে দিয়ে চুপ চাপ বসে থাকি—সেদিন আমার পক্ষে ভালো লেখা অসম্ভব।"

সুধাময়ের পাঞ্জাবির বুকপকেটে একটা কলমের মাথা উঁকি মারছিল। শোভনার নজর সেই দিকে গেল। একটু সাহস পেয়ে প্রশ্ন করলো, "ওই কলমেই আপনি সব লেখেন?"

এতে অবাক হবার কি আছে, সুধাময় বুঝতে পারলেন না। "কি করি বলুন, আমি তো আর শরৎ বাবু নই, যে ডজনখানেক কলম নিয়ে সংসার করবো। আমার সবেধন নীলমণি ইনি। দেখুন না"—ব'লে সুধাময় কলমটা বার করে শোভনার দিকে এগিয়ে দিলেন।

শোভনার লজ্জার কুয়াশা যেন ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। অন্য কেউ হলে, এতোক্ষণ ও মাথা নীচু করে বসে থাকতো। কিন্তু আজ সে লজ্জা করলো না। ছেলেমানুষির বশে কলমটার মুখ খুলতেই, সুধাময় হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। "কালি লেগে গিয়েছে তো হাতে? কলমের গলাটা লিক করে।"

শোভনার নরম ডান হাতের ছোটো ছোটো আঙুলে কালি লেগে গিয়েছে। সুধাময় তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বার করে বললেন, "ছিঃ ছিঃ, নিন আঙুলগুলো মুছে নিন।"

শোভনা কোমরে ঝোলানো নিজের সাদা রুমালটা টেনে নিয়ে হাতটা মুছতে মুছতে বললে, "বাঃ, আমার হাতের কালি দিয়ে, আপনার সাদা রুমালটা নষ্ট করবো কেন?"

সুধাময় হঠাৎ গভীর হয়ে উঠলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "এই তো, এই তো একটা বিরাট চিন্তার উপকরণ পাওয়া গেল! আমরা সবাই আমাদের মনের কলিমা দিয়ে অপরের শুভ্রতাকে নষ্ট করতে চাইছি। কলঙ্কিত পৃথিবীকে চুনকাম করবার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই। অথচ দুষ্টুছেলের মতো পরীক্ষার হল্-এ আমরা দোয়াত দোয়াত কালি ইচ্ছে করে ছড়িয়ে দিচ্ছি।"

তারপর কোনো কথা না বলেই সুধাময় উঠে পড়েছিলেন। যেন সব কথাই শেষ হয়ে গিয়েছে। যাবার আগে শুধু বললেন, "আমি দুঃখিত, কিন্তু আমাকে এখনই যেতে হবে। ভেরি ইম্পর্টাণ্ট পয়েণ্ট —একটু এদিক ওদিক হলেই গুলিয়ে যাবে।"

সুধাময়ের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। তখন ওঁর সদ্যপ্রকাশিত ছোটো গল্প—'সাদা কাগজ, কালো কালি'—বাংলা-সাহিত্যে আলোড়ন এনে দিয়েছে। সবাই বলছে, বাংলা-সাহিত্যে নতুন দিগন্ত যেন উন্মীলিত হচ্ছে।

গর্বে শোভনার বুক ফুলে উঠেছিল। কলেজের কমন-রূমে যখন এই গল্প নিয়ে মেয়েরা সবিস্ময়ে আলোচনা করেছে, শোভনার ইচ্ছা হয়েছে সবাইকে বলতে—'আমার একটা সামান্য কথা থেকেই এই গল্পের সৃষ্টি। জানো, সুধাময়ের কলম খুলতে গিয়ে সেদিন যদি আমার হাতে কালি না লাগতো, তা:হলে এ গল্প কোনোদিন লেখা হতো না?'

কিন্তু বলতে পারেনি শোভনা। কেউ জানেনা, সুধাময় এই হোস্টেলে এসেছিলেন। ওদের ধারণা সুধাময় বৃদ্ধ, সারাজীবন ধরে অনেক কিছু দেখে আজ কলম ধরেছেন। ওরা তো জানেনা সুধাময়ের বয়স অনেক কম। অস্বাভাবিক ভাবে পরিণত ওঁর দৃষ্টিভঙ্গী।

সুধাময় আবার এসেছেন। জিজ্ঞাসা করেছেন, "এই যে হঠাৎ চলে আসি, তাতে আপনার কোনো অসুবিধা হয় নাতো?"

"অসুবিধা আর কী? আপনি এসেছেন, এতেই আনন্দ। বিকেলবেলায় এই সময় অন্যেরা খেলাধূলা করে। আমার ও-সব ভালো লাগে না।" শোভনা উত্তর দিয়েছে।

সুধাময় যেন হতাশ হয়ে পড়লেন। বললেন, "না না, খেলাধুলো জিনিসটা খুবই প্রয়োজনীয়। দেখুন, আমাদের সাহিত্যে নায়িকারা হয় প্রেম করে, নয় নায়ককে পাখার হাওয়া করতে করতে খাবার খাওয়ায়, না হয় কেঁদে কেঁদে বালিশের তোয়ালে ভিজিয়ে ফেলে। বড়োজোর সে গান গায়, কিন্তু তাদের জীবনে স্পোর্টসের কোনো স্থানই নেই।"

শোভনা অবাক বিস্ময়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখটা নামিয়ে সে আস্তে আস্তে বললে, "আপনার 'সাদা কাগজ, কালো কালি' পড়েছি। আশ্চর্য, কেমন করে সামান্য একটা কথাকে অবলম্বন করে এতো গভীরে প্রবেশ করলেন!"

সুধাময় সেদিন শোভনার সরল, নিষ্পাপ বিস্ময়ে বোধহয় মনে মনে হেসেছিলেন; কিন্তু চেষ্টা করেও উত্তর দিতে পারেননি। বলেছেন, "কই, অতো ভেবে দেখিনা তো আমরা? যা মনে আসে তাই লিখে দিই।"

শোভনা বিশ্বাস করেনি। ভেবেছিল, লেখকের সেটাই তো রহস্য, সেইটাই তো মূলধন। যাকে তাকে কখনও তা বলা উচিত?

সুধাময়েব ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে শোভনার কৌতূহল বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু সুধাময় উদাসী, খামখেয়ালী। নিজের জীবন সম্বন্ধে যেন কোনো আগ্রহ নেই।

"পড়াশোনা?" সুধাময় হা-হা কবে হেসে উঠেছেন। "আমার হয়নি। আই-এ পরীক্ষা দেবার সময় হল্ থেকে তুলে দিয়েছিল। টুকবার অপরাধে পরীক্ষা বাতিল।"

চমকে উঠেছিল শোভনা। "আপনি টুকেছিলেন!" শোভনা বিশ্বাসই করতে পারছিল না।

পায়ের ছেড়া চটিটা নাড়তে নাড়তে সুধাময় বললেন, "আমি টুকিনি, কিন্তু একজনকে টুকতে সাহায্য করেছিলাম।" অন্তরের বেদনা চেপে রেখে, মৃদু হেসে সুধাময় বললেন, "ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পরীক্ষা এ-সবের নাম শুনলে এখন আমার ভয় হয়। ও-সবের হাত থেকে চিরকালের জন্য বেঁচে গিয়েছি।

বড়ো কষ্ট হলো শোভনার। এমন মানুষকে কেউ পরীক্ষার হল্ থেকে বার করে দেয়? বললে, "কিন্তু, সুধাময়বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে আপনি তো বাঁচতে পারবেন না। একদিন বি-এ এবং

এম-এ ক্লাশে আপনার রচনাইতো পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পড়ানো হবে। পরীক্ষার হলে বসে সাহিত্যের ছাত্ররা একদিন আপনার লেখা সম্বন্ধেই প্রশ্নের উত্তর দেবে।

"আমার লেখা? হা ঈশ্বর! কি বলছেন আপনি? সেদিন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে।" সুধাময় ম্লান হাসলেন।

শোভনা বললে, "আপনারই দেবিদাস 'স্বনের মৃত্যুতে' বলেছে—কেউ জানেনা কী হবে। আজ যিনি ফকির, কাল তিনি রাজা; আজ যিনি রাজাসনে, কাল তিনি গারদে—স্থিরতার অভাবের জন্যই সংসার এখনও একঘেয়ে হয়নি।"

সুধাময় বললেন, "তাই নাকি? এ-সব কথা বুঝি নায়কের মুখ দিয়ে বলিয়েছি?"

"আপনার নায়ক কী বলেছে তা আপনার মনে থাকেনা? মানুষকে এতো নিবিড়ভাবে ভালবেসেও আপনি এতো উদাসী?" শোভনা অভিযোগ করেছে।

"মনে রেখে কোনো লাভ হয়না, শোভনা দেবী।" বিমর্ষ সুধাময় উত্তর দিয়েছেন।

শোভনা দেখলো সুধাময়ের চোখ দুটো যেন ছল ছল করছে। মাথার চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে সুধাময় বললেন "এক এক সময় মনে হয়, আমি পাগল হয়ে যাবো। জগৎ-জোড়া এই দুঃখের হাটে, মানুষ যন্ত্রণায় ছটফট করছে। যখন দেখি প্রতিকার-হীন অত্যাচারে সে আর্ত চীৎকার করছে, সভ্যতার সর্বনাশা বিষে তার সমস্ত দেহটা নীল হয়ে আসছে, তখন আমি আর স্থির থাকতে পারিনা। কী করবো ভেবে পাই না। নিজের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য তখন আমি লিখতে বসি—প্রতিবাদ জানাই। কিন্তু…"

নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে সুধাময় যেন হঠাৎ লজ্জিত হয়ে পড়লেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "কিন্তু, who cares? মদন দত্ত লেনের একটা অন্ধকার ঘরে বসে সুধাময় গাঙুলীর মতো একটা

চ্যাংড়া ছোকরা যতো জোরেই চিৎকার করুক না কেন, ইতিহাস বিধাতার কানে তার একটা কথাও পৌঁছবে না। who cares? কে তাকে তোয়াক্কা করে?" সুধাময় যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন।

তারপর আশ্বস্ত হয়ে সুধাময় বললেন, "তবে সাহিত্যকে আমি সিরিয়াসলি গ্রহণ করিনি। যারা বলে অসি অপেক্ষা মসি শক্তিমান, তারা মিথ্যে কথা বলে। সাহিত্যিকের নামে, সমাজ সোনার খাঁচায় কতকগুলো রঙীন পাখী পুষছে। তারা পারে না, তারা এমন কিছুই করতে পারে না, যাতে এই নোংরা পৃথিবীটা বাসের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে।"

"মানে?" শোভনা ভীরুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো।

"মানে, আর লিখবো না। লেখা ছেড়ে দেবো ভাবছি।"

শোভনা খুব রেগে গিয়েছিল। সে আস্তে আস্তে বললে, "ভগবান আপনাকে প্রতিভা দিয়েছেন, কিন্তু সে-প্রতিভা অপচয়ের অধিকার দেননি, সুধাময়বাবু।"

সুধাময়, যে সুধাময় জীবনে কারুর কথা শোনেননি, কাউকে তোয়াক্কা করেননি, তিনিও যেন কেমন গম্ভীর হয়ে উঠলেন। পৃথিবীতে সবাই যেখানে হেরে গিয়েছে, সামান্য একটা কলেজে-পড়া মেয়ে সেখানে জিতেছে। সুধাময়কে সে সঞ্চয়ী হতে বলেছে, অপচয় করতে বারণ করেছে সে। মানুষের বেদনায় তিনি বিচলিত হবেন, কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত হবেন কেন?

শোভনা বলেছিল, "সুধাময়বাবু, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?"

"বলুন।" সুধাময় উত্তর দিয়েছিলেন।

"গল্প লিখে শুধু কি হবে? একটা উপন্যাস লিখুন। এমন উপন্যাস, যার মধ্যে অজস্র মানুষ নিজেদের ছবি দেখতে পাবে, যা পড়ে আমরা সবাই অবাক হয়ে যাবো। আপনার প্রথম গল্পের মধ্যেই তো উপন্যাসের ইঙ্গিত রয়েছে। ঐ বীজটিকে মহীরুহতে পরিণত করুন।"

সুধাময় প্রথমে রাজী হননি। "ওরে বাবা, উপন্যাস! ও আমার দ্বারা সম্ভব নয়।"

শোভনা আশা ছাড়েনি। উৎসাহ দিয়েছে। বলেছে, "আপনার প্রথম পরিচ্ছেদটা কবে শোনাবেন?"

সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। 'মনের মৃত্যু' রচনার নেপথ্য কাহিনী যদি কোনোদিন লেখা হয়, সেইটাই আর একটা উপন্যাস হয়ে যাবে।

কলেজ থেকে বেরিয়ে সোজা পার্কসার্কাস ময়দানে চলে আসতো শোভনা। এসে দেখতো ছাতা মাথায় সুধাময় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হাতে কয়েকটা পাতা লেখা—সারাদিনের পরিশ্রমের ফসল।

এক এক সময় হতাশ হয়ে পড়েছেন সুধাময়। "আর পারছি না—লেখা আর বেরোচ্ছে না," সুধাময় কাতরভাবে বলেছেন।

শোভনা কিন্তু জানে সুধাময় বড়ো হবেন, তাঁর খ্যাতির শঙ্খধ্বনিতে একদিন দিক-বিদিক মুখরিত হবে। শোভনা বলেছে, "আপনাকে লিখতেই হবে। মানুষকে ভালোবাসার লোক পৃথিবীতে বেশী নেই, সুধাময় বাবু। সংসারে সবাই নিজের নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। আপনাব অনুভূতির কাহিনী সবাইকে জানাতে হবে তো। আপনার লেখা একদিন বাংলাদেশের লোকদের হাতে হাতে ঘুরবে।"

সুধাময় অবিশ্বাসের হাসি হেসেছেন। "আমার লেখা? মাসিক পত্রিকায় যার গোটাকয়েক গল্প বেরিয়েছে? এমন লোক বাংলাদেশে অন্ততঃ দশ হাজার আছে। আমি নাম করবো! আমার উপন্যাস লোকের হাতে হাতে ঘুরবে!"

শোভনা বলেছে, "দেখি, কী লিখলেন আজ?"

সুধাময় পড়তে আরম্ভ করেছেন। পড়তে আরম্ভ করলেই, সুধাময়ের সব দুর্বলতা, সব সন্দেহ যেন এক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। সুধাময় তখন অন্যজগতে ফিরে যান। সে জগতের রাজাধিরাজ তিনিই।

অনুপ্রাণিত সুধাময় পড়া শেষ করে বলেন, "আমি অনেক

পেয়েছি—লেখার আনন্দেই আমার সব পাওনা শোধ হয়ে গিয়েছে। আমার অভাব আছে, অনটন আছে, দারিদ্র্য আছে—কিন্তু সেই সঙ্গে সাহস আছে। সত্য, যা প্রকাশের প্রয়োজন আছে, তা আমি বলে যাবোই।”

আর আজ? শোভনার হাসি পেল। আজকের সুধাময় সে-সব সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছেন।

অবশেষে সত্যই একদিন সুধাময়ের লেখা শেষ হলো। সে-দিনটা শোভনার বেশ মনে আছে। ঠিক ঐদিনই ওর হোস্টেল ছেড়ে বড়োদিনের ছুটিতে বাড়ি যাবার কথা। সুধাময় হঠাৎ হোস্টেলে এসে হাজির হয়েছিলেন। সুধাময় সেদিন একেবারে অন্য মানুষ। ওঁকে যেন চেনা যাচ্ছে না। আনন্দে, পরিতৃপ্তিতে, আত্ম-বিশ্বাসে মুখখানা যেন ঝলমল করছে। শোভনা ঠিক করে রেখেছিল, আজ সে তার গাম্ভীর্যের আবরণ ভেঙে ফেলবে। লেখককে আজ শ্রদ্ধা না জানিয়ে, একটু মজা করবে, একটু রসিকতা করবে।

কিন্তু সুধাময় এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। ভাগ্যিস ভিজিটরস্ রূমে কেউ ছিলনা? উনি যে ধরনের মানুষ তাতে একঘর লোক থাকলেও হয়তো ওঁর আট্‌কাতো না। শোভনার দিকে সুধাময় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। শোভনার কান-দুটো গরম হয়ে উঠেছিল। বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। ভয়ও করছিল। সুধাময়কে একেবারে বোঝা যাচ্ছে না। পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে নীরব সুধাময় একভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। সাহিত্যিকের অফুরন্ত শব্দভাণ্ডারে কে যেন তালাচাবি লাগিয়ে দিয়েছে।

অনেক চেষ্টা করে সুধাময় যেন মনের কথা খুঁজে পেলেন। কোনোরকমে ঢোক গিলে বললেন, “কেন? কেন আমার জন্য আপনি এতো করলেন?”

পরিবেশটা হালকা করার জন্য শোভনা বললে, “সাহিত্যের

ইতিহাসে যদি কোনোরকমে বেঁচে থাকতে পারি, বোধ হয় সেই লোভে।”

সুধাময় সে-কথা বিশ্বাস করেননি। নতুন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা টেবিলে রেখে হঠাৎ শোভনার বাঁ-হাতটা চেপে ধরেছিলেন। ওর চুড়িগুলো ঝনঝন করে প্রতিবাদ করেছিল, শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে রক্তকণিকার সৈন্যবাহিনী দল বেঁধে হৈ হৈ করে ছুটে এসে সুধাময়কে সাবধান করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সুধাময় কিছুই শোনেননি। ওর হাতটাকে দেহের সব উষ্ণতা দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, “শোভনা! সেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ, শেলী, কীট্‌স্‌, শরৎচন্দ্র এঁরা সবাই তোমার তুলনায় আমার কাছে ছোটো। আমার কাছে তুমি, যে কী···”

হঠাৎ যেন চম্‌কে উঠলো শোভনা। পাশের ঘরে খাটটা হঠাৎ যেন শব্দ করে মড়মড় করে উঠলো। ঘুমের ঘোরে সুধাময় হয়তো পাশ ফিরলেন। আজ আর কেউ বিশ্বাস করবেনা। নিজের কাছেই কথাগুলো ব্যঙ্গের মতো মনে হচ্ছে। অথচ এমন একদিন ছিল যেদিন সুধাময়ের কাছে একটা সাধারণ শোভনা বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথের থেকেও বড়ো ছিল। সুধাময় সেদিন উপন্যাসের মুখবন্ধে এ-সব কথা লিখে দিতে চেয়েছিলেন। শোভনাই ওঁকে লিখতে দেয়নি। বোধহয় সেদিন বাধা না দিলেই ভালো হতো। দর্শনের সেই বিদগ্ধ অধ্যাপকের মতো (‘কন্যাকল্পা’ শ্রীমতী···কে যিনি তাঁর বই উৎসর্গ করেছিলেন, এবং পরে সেই কন্যাকল্পার পাণিগ্রহণ করতে যাঁর একটুও দ্বিধা হয়নি) ওঁকে প্রতিমুহূর্তে অপমান করা যেতো।

‘মনের মৃত্যু’ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাফল্য এসেছিল। সুধাময় যেন রাতারাতি বাংলার সাহিত্য মসনদ জয় করে বসলেন। তারপরের সে-গল্প তো অনেক দীর্ঘ। কেমন করে শোভনা একদিন সুধাময়ের গৃহে এসে হাজির হলো।

সুধাময়ের দরিদ্র কুটীরেই আসবার জন্য শোভনা প্রস্তুত ছিল।

ও বলেছিল, "আমি তো বড়োলোকের বউ হতে চাই না। আমি লেখকের ঘরনী হতে চাই। তুমি একমনে লিখে যাবে। লেখা নিয়ে পড়ে থাকবে। তার পরিবর্তে প্রয়োজন হলে আমি চাকরি করবো।"

কৃতজ্ঞতায় সুধাময়ের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছে। বলেছেন, "আমার সাহিত্যিক খেয়ালের জন্য, তুমি নিজেকে কেন বিলিয়ে দেবে?"

শোভনা হাসিমুখে বলেছে, "পৃথিবীর মানুষ তোমার লেখা পড়ে তাদের অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবে বলে। তুমি তাদের কথা ভাববে বলে।"

কিছুদিন চাকরি করেছিল শোভনা। তারপর আর দরকার হয়নি, সুধাময়ের সাফল্য এসেছে। সাফল্যের জোয়ার এসে তাদের অভাব অনটনকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তারপর সেই জোযারে সুধাময় নিজেই যে এমনভাবে ভেসে যাবেন, এমনভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন তা শোভনা কল্পনাও করতে পারেনি। আজ রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সুধাময়ের সাফল্যের সেই রূপটাও শোভনা আর একবার খুঁটিয়ে দেখতে পারতো। কিন্তু ভালো লাগছে না শোভনার, সুধাময়ের এই নোতুন ছবিটা ইচ্ছে করে চোখের সামনে আনতে মন কিছুতেই রাজী হচ্ছে না।

সুধাময়ের ঘরের ঘড়িটাতে রাত দুটো বাজলো। বিধাতা যেন এতোক্ষণে শোভনার উপর দয়া করলেন। ধীরে ধীরে ঘুমের মেঘ শোভনার সব সত্তাকে আচ্ছন্ন করলো।

দুই

ভোরের সূর্য উঠবার আগেই সুধাময় উঠে পড়লেন। এই সময়েই তিনি ওঠবার চেষ্টা করেন। পৃথিবীটা তখনও একটা ধোপ-ভাঙা তোয়ালের মতো থাকে। একটু পরেই বহু মানুষের কলুষিত হস্তস্পর্শে তোয়ালেটার সর্বাঙ্গে ছোপ-ছোপ দাগ পড়বে।

তখন আর ওটার দিকে তাকাতে ইচ্ছে করবেনা। রাত্রির অন্ধকার কে যেন সযত্নে সংসারের সকল মালিন্য সাবান লাগিয়ে পরিষ্কার করে ফেলে। প্রভাতের আলোতে পৃথিবী আবার তাই প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেখা দেয়। সুধাময় তাই এই ভোরে কলম ধরতে চান। এই সময়ের লেখাগুলো বেশ ধারালো হয়।

প্রত্যুষের সূর্যের দিকে তাকিয়ে সুধাময় আর একবার তাঁর সেই প্রিয় বাণীটি স্মরণ করলেন—"মানুষকে ভালবাসি আমি।"

সত্যিই তো, যেদিন তিনি ভালবাসতে ভুলে যাবেন, তখন কিছুই তো আর ভালো লাগবেনা। কাদের জন্য তিনি কলম ধরবেন? কী বিরাট স্বপ্ন তাঁর! নানা মানুষের নানা বিচিত্র সমস্যা তাঁর রচনায় প্রতিভাত হবে। ঐ-যে যারা পথে ঘাটে, গ্রামে, নগরে-প্রান্তরে প্রতিকূল পৃথিবীতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সংগ্রাম করছে, তাদের কথা আগামী কালের পৃথিবীর মানুষদের জন্য লিপিবদ্ধ করবেন তিনি। মানুষকে ভালবাসবেন তিনি। ভালবেসে ধন্য হবেন।

হঠাৎ পাশের ঘরের দিকে সুধাময়ের নজর পড়লো। ভোরের হাওয়ায় দরজার পর্দাটা দুলছে। ঐভাবেই দরজাটা সারারাত খোলা থাকে। ওদিকে শোভনা ঘুমিয়ে আছে। গতরাত্রে কি কোনো গণ্ডগোল হয়েছিল? সুধাময় স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন। শোভনা···না, ওইসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করলে, সুধাময় লিখবেন কখন? লেখক তো আর শুধু স্ত্রীর স্বামী নন। তিনি সমাজের, যাকে বলে কিনা ন্যাশনাল প্রপার্টি।

কলম ধরলেই লেখা বেরিয়ে পড়বে, সুধাময় ভেবেছিলেন। এই ভোরে কোনো অযথা চিন্তা এসে নিশ্চয়ই গল্পের পাখিকে তাড়িয়ে দেবে না। একটা নতুন উপন্যাসের উপর কাজ করছেন সুধাময়। যে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একটি নারী। কিন্তু গল্পের রঙীন ভ্রমরগুলো আজ যেন অন্য কোনো ফুলবাগানে ভিড় করেছে, সুধাময়ের নিকুঞ্জে তারা কিছুতেই আসতে চাইছে না। কলম হাতে করে সুধাময়

খানিকক্ষণ সাদা কাগজের উপর ছেলে মানুষের মতন হিজিবিজি দাগ কাটলেন। তারপর আবছা মনে পড়লো, গতরাত্রে যেন কী হয়েছিল ঠিক মনে করতে পারছেন না সুধাময়। শোভনার সঙ্গে রাত্রে যেন ওঁর দেখা হয়েছিল। তারপর উনি বোধহয় কিছু বলেছিলেন শোভনাকে। কিন্তু সে নিয়ে চিন্তা করে এমন সুন্দর সকালটা নষ্ট করে কী হবে? একটু পরেই তো শোভনা উঠবে, তখন ইচ্ছে করলেই সব জেনে নেওয়া যাবে।

সামনের দরজার রঙীন পর্দাটা ভোরের হাওয়ায় দুলছে। ঠিক যেন কোনো অশরীরিণী অপ্সরীর শাড়ির আঁচল। সে যেন নাচছে। পর্দার মধ্যে দিয়ে ও-ঘরের একটু অংশ মুহূর্তের জন্য দেখতে পাওয়া গেল। ওই ঘরেই শোভনা ঘুমিয়ে রয়েছে। ওই ঘরেই ও শুয়ে থাকে। দুই ঘরের মধ্যের দরজাটা খোলা থাকে।

সুধাময় চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। আস্তে আস্তে শোভনার ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি। খাটের উপর অঘোরে ঘুমোচ্ছে শোভনা। ঘুমের মধ্যে বিছানার লাল চাদরটা কুঁকড়ে সরে গিয়েছে। তোশকের ধারগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বালিশটাও বেঁকে গিয়েছে। তারই উপর বাঁ-দিকে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে রয়েছে শোভনা। শোভনার নরম নরম ছোট্ট ছোট্ট পা-দুটো এত ফরসা! সুধাময় যেন ওর আলতায় লাল পা দুটো জীবনে এই প্রথম দেখছেন। বাঁ-হাতটা ঘুমের ঘোরে মাথার তলায় রেখেছে শোভনা। কপালের কাছে কচি কচি চুলগুলো ভোরের হাওয়ায় অকারণে মাতামাতি করছে। ঘুমন্ত রাজকুমারীর সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। একটু থামলেন সুধাময়। না, রাজকন্যার সঙ্গে তুলনা চলেনা। রূপ আছে, সৌন্দর্য আছে, স্বাস্থ্য আছে, স্নিগ্ধতা আছে, কিন্তু রূপকথার সেই নিশ্চিন্ত প্রশান্তি নেই। কোথায় যেন অপরিপূর্ণতা রয়েছে।

হঠাৎ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন সুধাময়। এই তো চাইছিলেন তিনি। একটি স্বামী-অবহেলিত নারীর অন্তরের বেদনার একটা

প্রতীক চাইছিলেন। সুসজ্জিত শয্যায় যে শুয়ে থাকে, অথচ কোনো শব্দহীন কণ্ঠ চীৎকার করে বলে—সব অপরিপূর্ণ, সব অপরিপূর্ণ!

সুধাময় দ্রুতবেগে বেরিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে নিজের নোট-বইটা নিয়ে এলেন। তারপর খুব সাবধানে নিদ্রিতা শোভনাকে দেখতে লাগলেন। আর নোট-বুকে পয়েন্ট লিখতে লাগলেন। অদ্ভুত একটা অসম্পূর্ণতা, অপরিতৃপ্তি, আশাভঙ্গের তীব্র বেদনা ফুটে উঠেছে এই ঘরে। অথচ আশ্চর্য, কেউ কথা বলছে না, দীর্ঘশ্বাস ফেলছে না, এমনকি চোখের কোণে জলও শুকিয়ে নেই। কেবল নিদ্রিতা শোভনার বুকটা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সামান্য উঠছে নামছে।

ওর মুখ, ওর নাক এবং চোখের পাতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখে নিলেন সুধাময়। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে মনটা। কোনো কথা না দিয়ে, একটিমাত্র চিত্রেই তিনি তাঁর নতুন নায়িকার সব সমস্যাকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করে দেবেন।

ঘুমের ঘোরে সিঁথির সিঁদুর কপাল ও মুখে লেগে এক আশ্চর্য স্বর্ণাভা সৃষ্টি করে। নববধুর সিঁদুর-রাঙা সেই মুখের ছবি তিনি তাঁর এক গল্পে ব্যবহার করেছিলেন। ভোরবেলায় শোভনার মুখ দেখে সেই আইডিয়া তাঁর মাথায় এসেছিল। শোভনা পরে তার জন্য লজ্জা পেয়েছিল; কপট রাগ করেছিল। সুধাময়ের হাতটা ধরে বলেছিল, “তুমি এখন থেকে অশ্লীল লিখতে শুরু করেছো।”

আজকের শোভনার দিকে তাকিয়ে সুধাময়ের হঠাৎ মনে হলো সিঁদুরের সেই রঙীন লজ্জা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তবে কি শোভনা আজকাল সিঁদুর পরে না? হতে পারে—সবই হতে পারে এই পৃথিবীতে। ভালো করে তাকালেন সুধাময়। না, শোভনা তো সিঁদুর পরেছে। কিন্তু কপালে এবং গালে সে-সিঁদুর তো তেমন ছড়িয়ে পড়েনি। কিংবা হয়তো ছড়িয়ে পড়েছে, শুধু সেই সলজ্জ মনের আভাটুকু নেই, যা সকল রংকেই আরও রঙীন করে তোলে।

ভালো করে এ-সব দেখা প্রয়োজন। এখনই পয়েন্টগুলো কাজে লেগে যাবে। সুধাময় আরও খুঁটিয়ে দেখবার জন্য শোভনার মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন। 'আর দাঁড়িয়েই চমকে উঠলেন। নিদ্রিত শোভনার ডান হাতের তলায় একটা বই পড়ে রয়েছে। ওঁর শেষ বইটা নিশ্চয়ই।

না তো। একি ! এ-যে 'মনের মৃত্যু'। তাহলে উনি যা ভেবেছেন তাই সত্যি। শোভনা ওঁর সম্বন্ধে কোনো চিন্তাই করে না। তাঁর সাম্প্রতিক কোনো বই-এর উপর ওর কোনো আগ্রহই নেই।

মাথাটা ঘুরে উঠলো সুধাময়ের। গল্প লেখার মেজাজটা আজ ভোরেই নষ্ট হয়ে গেল। অথচ লিখতেই হবে ওঁকে। মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গিয়েছে—আগামী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ দরদী সাহিত্যিক সুধাময় গঙ্গোপাধ্যায়ের এক মন-কেমন-করা কাহিনী।

নিজের চেয়ারে এসে বসলেন সুধাময়। এখন অনেক দায়িত্ব। দুটো চিত্রনাট্যের কাজ এই সপ্তাহেই শেষ করতে হবে। তারপরই শুভো সেন যে ছবিটা পরিচালনা করবে, তার সংলাপ নিয়ে পড়তে হবে। শুভো সেন চালাক লোক, সুধাময়কে কোলকাতায় বসিয়ে ভালো কাজ বার করা যাবে না, বোঝে। তাই নৈনিতালে পনেরো দিনের জন্য বাড়ি ঠিক করে রেখেছে। তারপর গতবারের বড়ো গল্পটা আবার ঢেলে সাজাতে হবে, প্রকাশক তাগাদা দিচ্ছেন। এর উপর আবার আকাশবাণীর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটা—সাহিত্যে চোখ বড়ো, না, হৃদয় বড়ো। সাহিত্যে চোখের পক্ষে বলবেন সদ্য-ইউরোপ-প্রত্যাগত অধ্যাপক হরিনারায়ণ রায়। সুধাময়কে হৃদয়ের পক্ষে ওকালতি করতে হবে।

চেয়ারে বসে সুধাময়ের হঠাৎ পুরনোদিনের কথা মনে পড়লো। যখন 'মনের মৃত্যু'র প্রতিটি পরিচ্ছেদ লিখতেন সুধাময়। টেবিল ছিল না, টেবিল-ল্যাম্প ছিল না, একটা কলম ছিল, তাও হাতে কালি লাগতো। এখন সব আছে।

সুধাময় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। 'মনের মৃত্যু' লেখাটা নেহাত-ই কাঁচা লেখা। ওতে অনেক শিল্পগত ত্রুটি আছে। একবার ভেবেছিলেন ওটাকে আবার ঢেলে সাজাবেন। কিন্তু কেন জানেন না, শোভনা রাজী হয়নি।

তারপর উনি অনেক ভালো বই লিখেছেন। 'ওরে বিহঙ্গ' উপন্যাসে উনি যে টেক্‌নিক ব্যবহার করেছেন, 'মনের মৃত্যু' তার দু'মাইলের মধ্যে আসতে পারে না। সুধাময় ভাবলেন, তাঁর প্রতি বইতে তিনি নতুন পরীক্ষা করেছেন। আর প্রতিটি লেখাতে মানুষের প্রতি তাঁর তীব্র ভালবাসা ফুটে উঠেছে। এক মুহূর্তের জন্য চিন্তাটা বন্ধ করে দিলেন সুধাময়। ভিতর থেকে কে যেন চিমটি কাটলো।

তাঁর স্বল্পপরিসর অথচ ঘটনাবহুল জীবনের দিকে একবার ফিরে তাকালেন সুধাময়। 'মনের মৃত্যু' দিয়ে রাতারাতি সাহিত্য-সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন। সাফল্য এসেছিল অবিশ্বাস্যভাবে। খাওয়াপরা সম্বন্ধে আর বিশেষ ভাবতে হয়নি। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসে আঙ্গিকের নূতন পরীক্ষা করলেন সুধাময়। পাঠকরা তাকে সামাদর জানিয়েছে। প্রকাশকরা উৎসাহ দিয়েছেন, সিনেমাওয়ালারা সঙ্গে সঙ্গে গল্প কিনে নিয়েছেন। সভা-সমিতিতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ এসেছে। মানুষকে ভালবাসার পুবস্কার সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গিয়াছে।

কিন্তু শোভনা? সে খুশী হয়নি। শোভনা বলেছিল, "পৃথিবীতে এতো লোক থাকতে একজন জজের মেয়ে নিয়ে লিখতে হবে কেন?"

সুধাময় রেগে উঠেছিলেন। "ওদের জীবনেও গল্প থাকতে পারে।"

"কিন্তু সে-জীবন সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি?" শোভনা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেছিল।

সুধাময় উত্তর দিয়েছিলেন, যথেষ্ট জানি। জাস্টিস চ্যাটার্জীর মেয়ে পুরীতে তিন ঘণ্টা ধরে সব কিছু confess করেছেন। আমাকে গল্প লিখতে অনুরোধ করেছেন।"

শোভনার মুখে তবু হাসি ফোটেনি। যা আমরা ভালভাবে জানি

না, যাকে দূর থেকে দেখে আমরা বিস্মিত হই—সে-সম্বন্ধে লেখা কিছুতেই গভীর হবে না, শোভনার বিশ্বাস।

সুধাময় বিশেষ কর্ণপাত করেননি। তিনি আজ সমস্ত দেশের। জাতি তাঁর কাছে অনেক প্রত্যাশা করে। একা শোভনার কথায় কি এসে যায়? স্ত্রীর কথামতো চলে কেউ সাহিত্যে প্রখ্যাত হয়েছে বলে সুধাময়ের জানা নেই।

কিন্তু সুধাময় বুঝেছিলেন, তাঁর দু'পাশের জগৎ যেন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষকে শুধু গল্পের উপাদান বলে মনে হচ্ছে আজকাল। গল্পের কাজে যদি লাগে তবে সে-মানুষের জুতো বুরুশ করে দিতেও রাজী আছেন সুধাময়। কিন্তু তা ছাড়া কোনো কিছুতেই আগ্রহ নেই তাঁর। সুধাময়ের একবার ভয় হয়েছিল, তাঁর হৃদয়টা কি শুকিয়ে আসছে? কিন্তু তারপরই বিশ্বাস ফিরে এসেছে। পৃথিবী, ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে নিস্পৃহতা আসছে। এই নিস্পৃহতাই তো আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ।

শোভনা কিছুই বলে না। কিন্তু ওর ভয়, সুধাময় তাঁর কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। হাউ সিলি! সুধাময় ভাবেন। আজও তিনি মানুষকে ভালবাসেন। তাঁর সাহিত্যে, সেই ভালবাসারই জয়গান করেন। তাইতো তাঁর অগণিত পাঠক-পাঠিকা তাঁকে মরমী কথাশিল্পী বলে জানে।

কিন্তু শোভনা? শোভনা মুখে কিছুই বলেনা। জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয়না সুধাময়ের। হয়তো বলে বসবে—"মনের মৃত্যু'তে তুমি হৃদয়ের সব মাধুর্যকে একত্রিত করে তিলে তিলে ছবি এঁকেছিলে।"

আর এখন? সুধাময় কি সত্যিই কাউকে আর ভালবাসেন না? মিথ্যা কথা। সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেই তিনি হৃদয়কে বড়ো করবার চেষ্টা করেছেন। এ কথা সত্য, শোভনার সঙ্গে তাঁর নতুন চরিত্রদের নিয়ে তিনি আলোচনা করেন না। মেয়েদের হোস্টেলে শোভনা বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ লেখককে একদিন উৎসাহ অনুপ্রেরণা

দিয়েছিল, তা বোধহয় প্রেমেরই অপর একটা রূপ, নিছক সাহিত্যের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো যোগ নেই। সুধাময় নিজের মনকে বোঝাতে চাইলেন। সুধাময়ের জীবনের গতিপথ তারপর অনেক পরিবর্তিত হয়েছে, সুধাময় তা জানেন! কিন্তু লেখকের পক্ষে তাই তো কাম্য। ভুল করেছিলেন সুধাময়। জীবন ও সাহিত্য এক নয়। সাহিত্যিকের জীবনচর্চার সঙ্গে সাহিত্যচর্চার কোন সম্পর্ক নেই। শোভনা একদিন ছিল তাঁর পদতলের মুগ্ধ অনুরাগিণী। পূজারিনীকে সহধর্মিণীর উচ্চাসনে টেনে তুললেন সুধাময়, কিন্তু সে বুঝলো না। সুধাময় তাঁর তরুণ উদীয়মান সাহিত্যিক বন্ধুদের বলে যাবেন—"আর যাই করো, তোমার অনুরাগিণী কোনো পাঠিকাকে বিয়ে করোনা।"

এসব ভাবা সত্ত্বেও শোভনাকে সুধাময় যেন একটু ভয় করেন। সামান্য একটু উত্তেজক পানীয় মাঝে মাঝে উনি পান করছেন। নিজের জন্য নয়, তাঁর পাঠকদের জন্যই তাঁকে পান করতে হচ্ছে, এতে লেখার জোর বেড়ে যায়।

শোভনা কান্নাকাটি করেছিল। রেগে উঠেছিলেন সুধাময়। "স্ত্রীর আঁচল ধরে পৃথিবীতে কেউ বড়ো লেখক হয়নি। ডিকেন্স, টলস্টয় বউদের ক'টা কথা শুনেছিলেন? আর রবীন্দ্রনাথ? বেশ সন্দেহ হয়, যৌবনে স্ত্রীবিয়োগ না হলে, তার প্রতিভা ঐভাবে বিকশিত হতো কিনা।"

শোভনা তার ডাগর ডাগর চোখ-দুটি তুলে বলেছিল, "কিন্তু তোমার শরীর?"

"শরীরের থেকে লেখার মূল্য আমার কাছে অনেক বেশী। ভালো লিখতে চাই আমি।" সুধাময় নিস্পৃহ হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন।

শোভনা তখন মনে করিয়ে দিয়েছিল, "কিছু না খেয়েই তো তুমি 'মনের মৃত্যু' লিখেছিলে। তুমি বলেছিলে, মনকে কেউ হত্যা করতে পারে না, যদি না আমরা নিজেরাই আত্মঘাতী হই।"

অসহ্য! রাগে অপমানে ফেটে পড়েছিলেন সুধাময়! হা ঈশ্বর,

কেন ওই বইটা তিনি লিখেছিলেন? উনি জানেন, ওই বইটাতে কিছুই নেই। শুধু কয়েকটা বড়ো বড়ো সেন্টিমেন্টাল কথা আছে। ওঁর সাহিত্য-জীবনে ঐ বইটার কোনো দাম নেই। বাংলাদেশের লোকেরা না বুঝতে পেরে কিছুদিন হৈ-হৈ করেছিল।

সাহিত্যের রাজপথে পরিভ্রমণ করে এতদিনে তিনি বুঝেছেন, সবকিছুই অনুভব করে লিখতে হবে, এমন কোনো মাথার-দিব্য মা-সরস্বতী লেখককে দেননি। তবে, পাঠক বিপথে পরিচালিত হতে চায়। সে চায়, এমন ভাবে লেখো যেন লেখা পড়ে মনে হয়, তুমি নিজেই সব অনুভব করেছো। তোমার প্রতিটি অক্ষরে তোমার বুকের রক্তের উত্তপ্ত স্পর্শ পেতে চাই আমরা। সেইখানেই তো লেখকের বাহাদুরি—সে নিজে না কেঁদেও অপরকে কাঁদাতে পারে। Special effect সৃষ্টি করতে পারে।

এ-কথা সত্য, আজকাল কিছুই ভালো লাগেনা তাঁর। পারিপার্শ্বিক তাঁর মধ্যে কোনো বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না, মানুষের মনের সব সমস্যা তাঁর তো জানা হয়ে গিয়েছে। এরা একঘেয়ে, এদের জীবন পৌনঃপুনিকতা দোষে দুষ্ট। একই ঘটনা পৃথিবীতে বারবার ঘটছে। এই একঘেয়ে জীবন থেকে তিনি যে গল্প লিখতে পারেন, এবং সে গল্প যে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, তার একমাত্র কারণ—সুধাময় তাঁর নিজের দামী কলমটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই কলমের গুণেই সামান্য অসামান্য হয়ে ওঠে, সাধারণ হয়ে ওঠে অসাধারণ।

এ শুধু সুধাময়ের নিজের কথা নয়, সমালোচকরাও তাঁর শেষ উপন্যাস সম্বন্ধে ঐ একই কথা লিখেছিলেন। "সুধাময়-মানস ক্রমশঃ পরিণত হচ্ছে। উৎস থেকে সাগরের পথে যেতে যেতে ক্রমশঃ বিস্তৃত ও শান্ত হচ্ছে।"

ওঁর শেষ উপন্যাস 'যাবার আগে'। হৃদয়ের সব আবেগ ঢেলে দিয়েই লিখেছেন। তবু শোভনার মন তিনি সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। সুধাময় এবার নড়ে চড়ে বসলেন। পুরনো কথা ভেবে সময়

নষ্ট করে কী হবে? তার থেকে লেখায় মন দেওয়া যাক। আলমারি থেকে বোতলটা বার করে একটু গলা ভিজিয়ে নিতে পারলে হতো। কিন্তু নিজের বাড়িতেও একটু স্বাধীনতা নেই। অথচ শিল্পীর অন্তরের প্রথম কথাই হলো স্বাধীনতা। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো আকাশে উড়তে হবে, তবে তো নব নব সৃষ্টির আনন্দে সে বিভোর হয়ে উঠবে।

কিন্তু শোভনা বুঝবে না। বলবে, "অমুক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমুক ভট্টাচার্য···কিভাবে নিজেদের শেষ করলেন দেখলে তো?"

সুধাময় রেগে উঠেছিলেন। "অমুক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার তুলনা? ছেলেটা প্রথমে গোটাকয়েক লিখেছিল। তারপর একেবারে সাধারণের ভিড়ে মিশে গেল।"

সুধাময় আবার বাইরের দিকে তাকালেন। ঠিক সেই সময়েই ঠক্ করে আওয়াজ হলো। খবরের কাগজওয়ালা জানলার মধ্য দিয়ে আজকের কাগজটা ছুঁড়ে দিলে।

কাগজটা তুলে নিয়েই সুধাময় অবাক হয়ে গেলেন—প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো করে ঘোষণা। সুদূর দিল্লীতেও সুধাময়ের খ্যাতি পৌঁছিয়েছে। বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তির জন্য 'যাবার আগে' উপন্যাসের লেখক শ্রীসুধাময় গঙ্গোপাধ্যায়কে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

সংবাদপত্রের নয়াদিল্লী প্রতিনিধি তারযোগে জানিয়েছেন—"এই মরমী কথাশিল্পী তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাসটিতে যে তীব্র জীবনবোধ, মহানুভবতা ও মানব-প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন—আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে তাহার তুলনা বিরল।"

সুধাময়ের সর্বশরীরে আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল। কাগজটা আবার পড়তে লাগলেন। নয়াদিল্লীস্থ বিশেষ প্রতিনিধি লিখছেন—"ভারত-সরকারের নূতন পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাসখানি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। জাতীয় সমাজ-উন্নয়ন বোর্ডের সভ্যা শ্রীমতি শোভা সেন আমার সঙ্গে

এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে, 'যাবার আগে' উপন্যাসখানিকে পুরস্কার দানের জন্য ভারত-সরকারকে অভিনন্দন জানান এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় উপন্যাসখানির অনুবাদের জন্য আকাদমির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরিশেষে শ্রীমতী সেন আশা প্রকাশ করেন যে, সমাজের পঙ্কিল আবর্ত হইতে একটি ভাগ্যহীনা বালিকাকে উদ্ধারের জন্য এই উপন্যাসের নায়ক অনন্ত যে মানবিক প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যেন ভারতের প্রতিটি গৃহের আলোচনার বিষয় হইয়া উঠে।"

সরস্বতী ও অনন্ত—'যাবার আগে' উপন্যাসেব এই প্রধান তুটি চরিত্রকে যথাযথ আঁকতে সুধাময় কোনো পরিশ্রমের ক্রটি রাখেননি। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। অনন্তই যেন লেখক। অনেকদিন আগে ইছামতী নদীর তীরে তুটি ছেলেমেয়ে একসঙ্গে খেলা করতো, গান গাইতো, মাছ ধরতো। তারপর ফুলের মতো মেয়ে সরস্বতী একদিন ছিন্নমূল হয়ে পথের উপর এসে পড়লো। কতো লোক তাকে পথের ধূলায় পদদলিত করলো। সেই সময় আবার দেখা হলো লেখক অনন্ত ও পতিতা সরস্বতীর।

বিরাট উপন্যাস। চারশো পৃষ্ঠা জুড়ে যে নাটক সেখানে সুধাময় সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য সুধাময়কে অবশ্য বেশী ভাবতে হয়নি, কলমের ডগায় হুড় হুড় করে লেখা বেরিয়ে এসেছে। আজ সে-সব দিনগুলোর কথা আবার মনে পড়ছে। না, আজ আর লেখা হবে না। সুধাময় কলমটা বন্ধ করে রাখলেন।

এইবার টেলিফোনের পালা। ভোরের কাগজে খবরটা বিত্যুৎ-বেগে ছড়িয়ে পড়েছে।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং। "হ্যালো, সুধাময় নাকি ?" গতবছরের পুরস্কার প্রাপ্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করছেন। "কংগ্রাচুলেশন, ব্রাদার। গতরাত্রেই খবরটা পেয়েছিলাম, তখন আর তোমাকে জ্বালাতন করিনি।"

ক্রিং ক্রিং। "হ্যালো আমি বসুধারার সম্পাদক চারু কথা

কইছি। জয় হোক তোমার। তোমার বইটা পড়েছি। খুব ভালো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে পড়ে অত্যন্ত সুখী হতেন।"

ক্রিং ক্রিং। "হ্যালো, আমি প্রকাশক জগদীশ সিংহ কথা বলছি। এবার যে আপনি পাবেন, তা আমরা আগে থেকেই জানতাম। কিন্তু বোকামি করে কেন যে দু'হাজার ছাপলাম। আর একটা লম্বা টানের সংস্করণ আজই প্রেসে পাঠাচ্ছি। প্রুফটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি দেখে দিতে হবে।"

ক্রিং ক্রিং। "হ্যালো, আমি প্রোডিউসার খোকন মিত্র কথা বলছি। মধুছন্দা আমাকে এইমাত্র টেলিফোন করেছিল। 'যাবার আগে' পড়ে ও ভয়ঙ্কর মুভ্‌ড্‌! যাকে লাখটাকার কমে পাওয়া যায় না, সে বলছে সরস্বতী চরিত্রটার জন্য এনি অ্যামাউণ্টে কনট্রাক্ট সই করবে। আমি আপনার সঙ্গে এখনই দেখা করতে যাচ্ছি।"

"না না, আজ নয়।" সুধাময় বিনীত অনুরোধ করলেন। "আজ আমাকে তোমরা একটু একা থাকতে দাও!" সুধাময়ের কাতর কণ্ঠ শোনা গেল।

আরও টেলিফোন আসছে। সুধাময় বোধ হয় এবার পাগল হয়ে যাবেন।

এদিকে ফুল ও মালা হাতে, বাড়িতেও লোক আসতে শুরু করেছে। সুধাময়ের ঘরের চেয়ারগুলো বোঝাই হয়ে গিয়েছে। শোভনার ঘরের চেয়ারগুলো শোভনাই ভেতর থেকে পাঠিয়ে দিল। কখন সুধাময়ের অলক্ষ্যেই সে উঠে পড়েছে।

স্থানীয় ভ্রাতৃসংঘের ছেলেরা হৈ-হৈ করে এসে গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে গেল। ওদের সেক্রেটারি একটু গুণ্ডা ধরণের হলেও, ছোকরার মনটা ভালো।

সে বললে, "স্যর, আপনি তেড়ে লিখে যান। আর আপনি নির্ভয়ে লিখে যান স্যার। কেউ যদি আপনাকে একটুও ভয় দেখায় স্যর, দয়া করে আমাদের একটু খবর দেবেন। ভ্রাতৃসংঘের একটি

সভ্য বেঁচে থাকতে আপনার টিকিটি পর্যন্ত কেউ ছুঁতে পারবে না।”

শোভনা রান্নাঘরে বসে বসে চায়ের ব্যবস্থা করছে। ইতিমধ্যে তিন ট্রে চা পাঠিয়েছে—তা মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। তা যাক্, সুধাময়ের আজ বড় আনন্দের দিন।

উদীয়মান সাহিত্যিক প্রভাত কর যখন ঘরে এসে ঢুকলেন, তখন একটা চেয়ারও খালি নেই। প্রভাত সুধাময় ও শোভনার বিশেষ স্নেহভাজন। সুধাময় পরিচিত অপরিচিত পরিবৃত হয়ে নীরবে বসে ছিলেন। এবং মাঝে মাঝে সরস্বতী ও অনন্ত চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন।

প্রভাত কর কোনো প্রশ্ন না করেই সোজা ভিতরে ঢুকে গেলেন। “কই, বৌদি কই?”

“এই-যে ভাই, প্রভাত।” শোভনা রান্নাঘর থেকে উত্তর দিল।

রান্নাঘরের সামনে একটা পিঁড়ি পেতে প্রভাত কর বসে পড়লেন। “একি বৌদি! আজ শুধু চা? ওতে চলবে না। আজকে আরও অনেক কিছু চাই।”

“ঐ-সব হুকুম—যখন বিয়ে করবে, বো আসবে, তখন করবে। এখন বৌদি যা দেবে তাই মুখ বুজে খেতে হবে।” শোভনা স্নিগ্ধ হেসে বললে।

“বেশ, এখন শুধু চা-ই দিন। দুপুরে আবার কী পাওয়া যায় দেখি”—প্রভাত কর বললেন।

“তা সাহিত্য-সভা ছেড়ে, হঠাৎ অন্দরমহলে কেন?” শোভনা জিজ্ঞাসা করলে।

“সাহিত্যিকের বৌ-এর দেমাক কতখানি বাড়লো দেখতে।”

“কী দেখছো?” শোভনা এবার প্রশ্ন করলো।

“সে এখন, মাপজোক করে বুঝতে হবে। হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন বলছিলেন, লেখকের স্ত্রীরা লেখা-টেখা নিয়ে মাথা ঘামান

না। ওঁরা কেবল একটা জিনিস বোঝেন। সেটি হচ্ছে টাকা। কত কম লেখা দিয়ে কত বেশী আদায় করা যেতে পারে!"

শোভনা গরম জলের কেটলীটা নামাতে নামাতে বললে, "তাই বুঝি ভাই? টাকার লোভে বুঝি মেয়েরা লেখকদের বিয়ে করে?"

"তার সঙ্গে আরও কয়েকটা লোভ যোগ করে নিন—খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সম্মান—" কথা শেষ করবার আগে প্রভাত করকে সুধাময় ডেকে পাঠালেন, ফলে তিনি শোভনার দীর্ঘশ্বাসটা লক্ষ্য করলেন না।

প্রভাত কর সুধাময়ের পাশে এসে বসলেন। প্রভাতের মুখের দিকে তাকিয়ে সুধাময় ধীরে ধীরে বললেন, "তোমরা আজকাল শুধু মাথার গল্প লিখছো, তাই না?"

"আজ্ঞে, তা বলতে পারেন। ইউরোপে এখন হেড-এর গল্পই চলছে কিনা। কিন্তু 'যাবার আগে' আর একবার প্রমাণ করলো যে হার্ট-টা অর্থাৎ হৃদয়টা এখনও বাংলাদেশে রাজত্ব করছে। সে অনেক বড়ো।" প্রভাত কর কথা বলতে বলতে সুধাময়ের রহস্যময় চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"সত্যি, সরস্বতীর জন্য আপনি হৃদয়ে অনুভব করেছেন। তীব্র অনুভূতির এক চূড়ান্ত মুহূর্তে সরস্বতী বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম চরিত্রের রূপ লাভ করেছে।" প্রভাত কর আবার বললেন।

সুধাময় যেন কেমন হয়ে গেলেন। কিছুই বললেন না। প্রভাত জিজ্ঞাসা করলেন, "এই কাহিনীর অনন্ত, সে তো আপনি-ই। নিজে না হলে চরিত্রটা এতো inspring হতে পারতো না।"

সুধাময় একটু হাসলেন। "তোমাকে কিছুই বলতে সাহস হয়না, প্রভাত। তোমার বয়স কম, তুমি আমাদের পরেও অনেকদিন বাঁচবে। কোনো স্বীকারোক্তি করলে, চিরকালের জন্য সাহিত্যিকের ইতিহাসে জবাবদিহি করতে হবে।"

প্রভাত কর যেন ভাবে বুঝলেন। "ঠিক আছে, আপনাকে

আর কিছুই বলতে হবে না। তবে মানুষকে ভালবেসে সত্যি আপনি অনেক মূঢ় ম্লান মুখে ভাষা যুগিয়েছেন।"

সুধাময় একবার অন্দরমহলের দিকে নজর দিলেন। শোভনা ছাড়া আর কাউকেই তিনি ভয় করেন না। প্রভাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ-যুগের মানসিকতার সঙ্গে আমাদের মেলে না। আমরা সাধারণ ছোটো ছোটো virtue—যেমন দয়া, মায়া, কৃতজ্ঞতা এ-সবে এখনও বিশ্বাস করি!"

মনস্তাত্ত্বিক লেখক প্রভাত করের চোখও ছলছল করছিল। ফ্রয়েড, আডলার, জয়েস-এর মধ্যে ডুবে থেকেও বেচারা হৃদয়-বৃত্তিটাকে একেবারে নষ্ট করতে পারেনি। সুধাময়ের আপাতঃ শান্ত বিমর্ষ মুখের দিকে তাকিয়ে প্রভাত শরৎচন্দ্রের সেই পুরনো কথাগুলো আবৃত্তি করতে লাগলেন—যারা শুধু দিলে, পেলনা কিছুই, সারাজীবন ধরে যারা ভেবে পেলনা—কেন সব-কিছু থেকেও, কোনো কিছুতেই অধিকার নেই তাদের—তারাই আমার মুখ খুলে দিল, তারাই আমাকে পাঠালে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।

প্রভাত কর বিদায় নিলেন। আর সুধাময় ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগলেন।

সরস্বতী—হাড়কাটা গলির মুখে, গ্যাস-পোস্টের স্তিমিত আলোকে একটা ক্লান্ত মুখ ভেসে উঠলো। সুধাময় ওইখানেই অনন্তর সঙ্গে পতিতা-সরস্বতীর প্রথম সাক্ষাৎ করিয়েছেন। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের এক ঘরোয়া বৈঠকে বক্তৃতা করে ফিরছিল অনন্ত।

না, সুধাময় পুরনো কাহিনী নিয়ে নিজেকে বিব্রত করবেন না। হঠাৎ খেয়াল হলো, সবাই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল। অথচ শোভনা?

দরজাটা প্রথমে বন্ধ করে দিলেন সুধাময়, যাতে বাইরের কেউ এসে তাঁকে জ্বালাতন করতে না পারে। জানালার খড়খড়িগুলোও

ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন সুধাময়। দিনদুপুরেও ঘরটা অন্ধকার হ'য়ে উঠলো।

সুধাময়ের মনের ভিতরটা হঠাৎ যেন জ্বলতে শুরু করেছে। শোভনা···শোভনাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করতে হবে। চটিটা পরেই রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন সুধাময়।

"শোনো—" সুধাময় ডাকলেন।

"তরকারিটা নামিয়ে যাচ্ছি।" শোভনা উত্তর দেয়।

"এসো লক্ষ্মীটি!" সুধাময় আবার ডাকলেন।

এই ডাক শোভনা অনেকদিন শোনেনি। অনেকদিন আগে, লেডি এজরা-হোস্টেলের একটা টেবিল-টেনিস-খেলা মেয়ে এমন ডাকে অভ্যস্ত ছিল। গামছায় হাতটা মুছে শোভনা উঠে দাঁড়ালো।

সুধাময় ওর হাতটা চেপে ধরলেন। ঘরের মধ্যে টেনে এনে, নিজেই শোভনার আঁচলটা হাতে দিয়ে বললেন, "মুখটা মুছে নাও। ঘামে ভিজে রয়েছে।"

থতমত খেয়ে শোভনা মুখটা মুছলো। সুধাময় যেন আরও কাছে এগিয়ে এলেন। ওঁর রুক্ষকণ্ঠে যতখানি সম্ভব কোমলতা এনে বললেন, "পৃথিবীর এতো লোক এতো কথা বললো, অথচ তুমি তো কিছুই বললে না, শোভনা!"

"আমি? আমি?" শোভনার যেন কথা বেরোচ্ছেনা! ওর চোখ-দুটো যেন ছলছল করছে। লজ্জা আসছে। 'মনের মৃত্যু'র লেখকের সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা হয়েছিল, সেইদিনেও কথা আটকিয়ে গিয়েছিল। এদিকে সুধাময় ওর মুখের দিকে আকুল প্রত্যাশায় তাকিয়ে আছেন।

শোভনা আস্তে আস্তে মুখটি তুলে সুধাময়ের দিকে তাকিয়ে, শান্তভাবে বললে, "আজ আমার বড়ো সুখের দিন। বড়ো গর্বের দিন। দেশ তোমাকে জয়মাল্য দিয়েছে। তোমার অন্তর, তোমার সরস্বতী···"

সুধাময় হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লেন। “ইডিয়ট! স্কাউনড্রেল! লায়ার!”

সুধাময়ের চোখ-দুটো যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে “I am not a fool!—আমি পাঁঠা নই।” সুধাময় শোভনার নরম দুই কাঁধে দুটো হিংস্র থাবা বসিয়ে গর্জন করে উঠলেন। শোভনা কিছুই বলতে চায়নি। কিন্তু মত্ত ব্যাঘ্রের গোপন ক্ষতে কে যেন অজ্ঞাতসারে ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়েছে।

সুধাময় মুখ ফিরিয়ে বললেন, “তোমার মুখ, তোমার চোখ, তোমার দেহের প্রতিটা লোম যে-ভাষায় কথা বলছে তা বোঝবার মতো বুদ্ধি আজও আমার আছে। আমি জীবনে মাত্র একটা বই লিখেছি, তারপর আর কিছুই লিখতে পারিনি! আমি মিথ্যেবাদী, আমি ভণ্ড? পৃথিবার এতো লোকের মধ্যে তুমি······তুমি বলবে?”

শোভনা বুঝলো তার কপালে আজ অনেক দুঃখ আছে। শান্ত-কণ্ঠে সে বললে, “এ-সব কী বলছ তুমি? তুমি চুপ করে বোসো, এখনই হয়তো রক্তের চাপ বেড়ে যাবে।” ওঁর হাতটা চেপে ধরবার চেষ্টা করলো শোভনা! কিন্তু এক ঝট্‌কায় হাতটা ছাড়িয়ে উনি নিজের ঘরে এসে বসলেন।

একমুহূর্ত পরে আবার উঠে দাঁড়ালেন সুধাময়। শোভনার কাছে গিয়ে বললেন, “দাও—”

“কী দেবো?” শোভনা জিজ্ঞাসা করে।

“ ‘মনের মৃত্যু’র কপিটা।”

শোভনা বুঝতে পারে, কিছু একটা করে বসবেন সুধাময়। ছুটে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে বইটা তুলে বুকের কাছে চেপে ধরল শোভনা। তার স্বপ্নের সুধাময়, তার প্রথম যৌবনের সুধাময় ওরই মধ্যে বেঁচে রয়েছে। যে সুধাময় মানুষকে ভালবাসতো, যে সুধাময় পৃথিবীকে বলেছিল—মনকে আমরা কেউ মারতে পারি না। শোভনা

বুঝলো, বইটা এখনই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবেন সুধাময়। ওঁর শেষ স্মৃতিটুকু চিরকালের মতো নষ্ট করে দেবেন।

"আমার বই, আমি চাইছি, তাও দিচ্ছোনা!" সুধাময় বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। "দাও—দাও বলছি!"

শোভনা, বেচারা শোভনা এবার মুখ ফুটে বললো, "তোমার বই, কিন্তু অনেকদিন আগে তুমি আমাকে দিয়েছিলে।"

সেই পাতাটা খুলে শোভনা ওর সামনে ধরলো। যেখানে লেখা—

শোভনা,

তোমায় কিছু দেবো ব'লে চায় যে আমার মন,

নাই বা তোমার থাকলো প্রয়োজন।

ইতি

সুধাময়

আরও অনেক কিছু লিখতে চেয়েছিলেন সুধাময়। ছাপার অক্ষরে উৎসর্গ করবার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু শোভনা কিছুতেই রাজী হয়নি। বলেছিল, "সেই বিখ্যাত অধ্যাপকের মতো উৎসর্গটা একদিন আপনার অনুশোচনার কারণ তো হতে পারে।"

পুরনো হাতের লেখাটা দেখিয়েই নিষ্কৃতি ছিলনা। শোভনা যেন একখানা বই দিয়ে সুধাময়কে ব্লাক্‌মেল করছে। বইটা উনি আগুনে পুড়িয়ে দিতেন, কিন্তু সেই সময়েই আবার দরজার কড়া নেড়ে উঠলো।

টেলিগ্রাফ-পিওন। দূরদূরান্ত থেকে অভিনন্দন টেলিগ্রাম এসেছে একগোছা। সই করে পিওনকে বিদায় দিয়ে টেলিগ্রামগুলো টেবিলের উপর রেখে হাঁপাতে লাগলেন সুধাময়।

শোভনা কী করবে? চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

সুধাময় কাঁপতে কাঁপতে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "আশ্চর্য তোমরা! এখনও ভাবছো লক্ষ্মীকেই আমি উপন্যাসে সরস্বতী করেছি। সম্পূর্ণ মিথ্যা—total lie."

শোভনার চোখ ফেটে জল আসছিল। জীবনে সে গভীরতা ও অন্তরের উত্তপ্ত স্পর্শ চেয়েছিল। সাহিত্যের মধ্যে সুন্দরকে খুঁজে পাবার আশা করেছিল। ভুল, সব ভুল! সুধাময়দের থেকে, নিরুপম সান্যালরা অনেক ভালো। তারা মনের গভীরে প্রবেশ করেনা সত্য, কিন্তু বাইরেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখার চেষ্টা করে। তারা পৃথিবীকে ভালবাসেনা—কিন্তু নিজের স্ত্রী, নিজের সন্তানদের ব্যবসার উপাদান বলে মনে করে না।

'লক্ষ্মী লক্ষ্মী। তার সঙ্গে আমার সরস্বতীর কোনোই মিল নেই। দুনিয়াতে কত মেয়েই তো দেহ বিক্রি করে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করে, তাদের সবারই নাম কি লক্ষ্মী?'—সুধাময় নিজেকে প্রশ্ন করেন।

তাঁর গল্পের সরস্বতীও দেহ বিক্রি করেছে। হাড়কাটা গলির অন্ধকারে সে তার আত্মাকে তিলে তিলে হত্যা করতে চেয়েছিল। পৃথিবীর কারুর কাছেই সে স্নেহ ভালবাসা পায়নি। একমাত্র অনন্ত তাকে অনন্ত স্নেহেই আশ্রয় দিয়েছিল। উষাকালে, পূর্বদিগন্তের সূর্যের দিকে তাকিয়ে অনন্ত ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'পৃথিবীতে সত্যই পাপ বলে কিছু আছে কিনা। পূর্বদিগন্তের সূর্য সেদিন উত্তর দিয়েছিল। অনন্ত আবিষ্কার করেছিল,' সূর্যের রক্তিমাভা শুধু তার স্ত্রী শুভ্রা, তার বোন অনিলাকেই নয়—সরস্বতীর বেদনাহত মুখটিকেও বিনা দ্বিধায় সমানভাবে রঙীন করে তুলেছিল।

আর লক্ষ্মী? নিজের লেখা নিয়েই তো বেঁচে থাকতে হবে সুধাময়কে। লক্ষ্মীকে তিনি দুটির বেশী কথা বলেননি। ওঁর সৎবোন লক্ষ্মী। কোনোদিন খোঁজখবর নেননি। বাবা মারা যাবার পরই আত্মীয়দের ঝঞ্ঝাট থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন সুধাময়। লক্ষ্মীর বর মরেছে শুনেছিলেন। পাকিস্থান থেকে ছেলেটাকে নিয়ে লক্ষ্মী পালিয়ে এসেছে, খবর পেয়েছিলেন। লক্ষ্মী দু' একটা চিঠি দিয়েছিল। তার বেশী কিছু করেনি। তারপর লক্ষ্মী নাকি কাদের

বাড়িতে রান্না করতো। সুধাময় ওসব নিয়ে খেয়াল করেননি। ওঁর যে কাউকে ভালো লাগতো না তখন। নিজের লেখা, আর নিজের চরিত্রদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, ভূত ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কোনোদিকেই তাঁর নজর দেবার সময় হয়নি। তারপর একদিন লক্ষ্মী কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছিল। সুধাময় ঘরে বসে লিখছিলেন। শোভনা ভিতরে ছিল, খবর পায়নি। সুধাময় সেদিন গল্পের এক প্রচণ্ড সঙ্কটময় পরিস্থিতি নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। লক্ষ্মীর ছেলেটার পা-দুটো নাকি পলিও-তে পড়ে গিয়েছে। চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার দরকার। সঙ্গে একটা বুড়ী এসেছিল। বুড়ীটা বললে, অনেক খুঁজে খুঁজে তোমাদের বাড়ি বার করেছি বাপু। অনাথা কমবয়সী মেয়ে, কান্নাকাটি করছিল, কোলকেতার কিছুই জানে না। তা বাপু চুপ করে থাকতে পারলাম না। খুঁজে খুঁজে নিয়ে এলাম।”

বেজায় রেগে উঠেছিলেন সুধাময়। চিৎকার করে বলেছিলেন, “আমাকে আর জ্বালাতন কোরোনা। গেট্ আউট্—”

লক্ষ্মী ভয়ে চম্‌কে উঠেছিল। বুড়ীটা ভয় পেয়ে বলেছিল, “একি অনাসৃষ্টি কাণ্ড গো।”

লক্ষ্মী চলে গিয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই একটা পোষ্টকার্ড পাঠিয়েছিল ঃ “শ্রীচরণেষু দাদা, আমি আমার পথ বাছিয়া লইয়াছি। তোমাকে আর জ্বালাতন করিব না।”

মেয়েটা ছোটবেলায় খুব শান্ত ছিল, সুধাময়ের মনে আছে এইতো সেদিন যেন ওর জন্ম হলো। ইস্কুল থেকে ফিরে এসে সুধাময় নারকোল দিয়ে মুড়ি খাচ্ছিলেন, সেই সময় শাঁখ বেজে উঠলো। তা সংসারের ও-সব সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে সুধাময়কে তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করলে চলবে না!

শোভনা চিঠিটা পড়েই বোধহয় সব বুঝতে পেরেছিল। বলেছিল, “একি করলে তুমি? তুমি না মানুষের মন নিয়ে নাড়াচাড়া করো?”

সুধাময় রেগে বলেছিলেন, "আমাকে জ্বালাতন কোরোনা। ওর মা-ও আমাকে কম কষ্ট দেয়নি।"

শোভনা সেদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সুধাময়, সুধাময়ের মুখে এ-কথা সে আশা করেনি। অজ্ঞান অবস্থায় শোভনা দেখেছিল পৈশাচিক উল্লাসে সুধাময় যেন নৃত্য করছেন—প্লট পাওয়া গিয়েছে। 'মনের মৃত্যু'র লেখক সুধাময় নিজের হাতেই যেন একটা ফ্রাঙ্কেন-স্টাইনে পরিবর্তিত হয়েছেন।

তারপরও সুধাময়ের নামে একটা উড়ো চিঠি এসেছিলঃ "আপনার ভগ্নী লজ্জাজনক জীবন যাপন করিতেছেন। সন্তানটিও মারা গিয়াছে।" একটা ঠিকানা লেখা ছিল। নোংরাপাড়ার ঠিকানা, চিৎপুরের কাছাকাছি।

শোভনা বলেছিল, "যাও। একবার অন্ততঃ ঘুরে এসো।"

কিন্তু সুধাময় যাননি।

কিন্তু এ-সবের সঙ্গে 'যাবার আগে' উপন্যাসের সরস্বতীর কী সম্পর্ক? ঐ চিঠিটা পাবার পরেই অবশ্য, সুধাময় 'যাবার আগে' লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু ··

চিৎপুরের সেই নোংরা ঠিকানাটা আজও সুধাময় ভোলেননি। '৩১।এম' ইচ্ছে করলে খুঁজে বার করতে পারতেন। উনি যেন যাননি, তার মানে এই নয় যে, লক্ষ্মীকে ভালবাসেন না তিনি। তখনই বুঝেছিলেন মেয়েটাকে তিনি ভালবাসেন। কিন্তু মনকে কোনো কারণেই উত্তেজিত করতে চাননি সুধাময়। তখন উপন্যাসের নায়ক অনন্তকে কী ভাবে আঁকবেন কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। কারণ সরস্বতী হলো প্রব্‌লেম, আর অনন্ত সলিউশন। সমস্যার সমাধান যদি সোজা পথে হয়ে যায় তাহলে সাধারণ উপন্যাস হয়ে গেল। সুধাময়ের কাছে পাঠকরা সেরকম উপন্যাস আশা করেন না।

সুধাময় আবিষ্কার করলেন, ওঁর হাতের তালু-দুটো ঘেমে উঠেছে। নিজের কল্পনা এখনও এতো দীন হয়নি, যে তাঁর বোনের গল্পটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখতে হবে।

তাঁর সরস্বতীর জন্ম সুধানন্দের মনোভূমিতে। কিন্তু তবু হঠাৎ যেন সুধাময়ের ভয় হচ্ছে। যদি···যদি সমস্ত পৃথিবী এ-কথা জানতে পারে। জানতে পারে যে নিজের বোনকে ঘৃণাভরে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়ে, তিনি উপন্যাসের নায়িকার জন্য চোখের জল ফেলেছেন। শোভনাকে বিশ্বাস নেই। কাউকে বিশ্বাস করেন না সুধাময়।

গতরাত্রের কথাটা মনে পড়লো সুধাময়ের। নেশার ঘোরে ছিলেন। তাই শোভনার কথাগুলো অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। চেষ্টা করেও মনে করতে পারছিলেন না। কিন্তু হঠাৎ মস্তিষ্কের অন্তর্দেশে কোনো ভূমিকম্পে হারিয়ে-যাওয়া কথাগুলো যেন আবার ভেসে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠলেন সুধাময়। সভয়ে কানের মধ্যে আঙুল গুঁজে দিলেন। শোভনা, of all persons in the world শোভনা তাঁকে বলেছে—"তোমার মনের মৃত্যু হয়েছে।" যে মানুষটা 'মনের মৃত্যু' লিখেছিল, সে আজ বেঁচে নেই। সে-মনের মৃত্যু হয়েছে।

নাড়ীর স্পন্দনটা যদি এখন মাপা যেতো, তাহলে বোধহয় একশো-পঁচিশ হতো। সুধাময় ভাবলেন। সুধাময়ের মধ্য থেকে আর একটা সুধাময় যেন বেরিয়ে আসছে। সে তরুণ, সে বুদ্ধিদীপ্ত। সে বলছে, "মনের মৃত্যু নেই, যদি না তুমি তাকে স্বহস্তে খুন করো।"

মিথ্যে কথা, প্রবীণ সুধাময় শব্দহীন ভাষায় চিৎকার করে উঠলেন। মনকে যে খুশী সে হত্যা করতে পারে। পরিবেশ, ঘটনা, শত্রু, মিত্র, পরিচিত, অপরিচিত, সবাই তাকে অতি সহজে খুন করতে পারে। কিন্তু সুধাময় নিজের মনকে নিজে গলা টিপে মারেননি। তবে কে মারলো তাকে ?—একটা সুধাময়ের মধ্যে অসংখ্য সুধাময় হঠাৎ যেন মারামারি শুরু করে দিল।

সুধাময় হিসেব করতে বসলেন। হা ঈশ্বর, পৃথিবীতে এতো লোক থাকতে শোভনা বলেছে, তার মনের মৃত্যু হয়েছে।

সুধাময় বুকের কাছে হাত দিলেন। না, তিনি তো বেঁচে রয়েছেন।

হঠাৎ মনে হলো লক্ষ্মীর কথা। লক্ষ্মী মেয়েটা বড়ো সুন্দর। ছোটবেলায় ওকে কত পেয়ারা পেড়ে দিয়েছেন সুধাময়। এক বিচিত্র অনুভূতিতে সুধাময়ের মন যেন পূর্ণ হয়ে উঠলো। লক্ষ্মী যদিও সৎ-বোন, তবুও তার দেহে একই রক্ত বইছে। সুধাময়ের হঠাৎ যেন মনে হলো তাঁর রক্তেও কোন অলক্ষ্য ছিদ্র দিয়ে যেন বিষ ঢুকছে—পাপের বিষ। সাপের বিষের থেকেও সর্বনাশা।

সুধাময় হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন—"শোভনা, শোভনা!"

রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে শোভনা দেখলো সুধাময় যেন কেমন হয়ে পড়েছেন। চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে। এই দিন-দুপুরেই সুধাময় কী মদ খেতে আরম্ভ করলেন নাকি? কিন্তু ওঁর টেবিলে তো গেলাস নেই, মুখ দিয়েও তো গন্ধ ছাড়ছে না।

"শোভনা"—দাঁতে দাঁত দিয়ে সুধাময় চাপা গর্জন করলেন।

শোভনা কী করবে বুঝতে পারছে না।

"গতকাল রাত্রে, আমি যখন মদ খেয়ে গেলাস ভাঙছিলাম, তখন তুমি কী বলেছিলে? কী বলেছিলে আমায়?" সুধাময়ের চোখ দুটো যেন এবার বেরিয়ে আসবে মনে হচ্ছে।

"চুপ করে রইলে কেন? বলো"—সুধাময় অস্থির হয়ে প্রশ্ন করলেন।

শোভনা বুঝতে পারে না, সে কী করবে? সে কী উত্তর দেবে? "তোমায়? তোমায় আমি কী বলবো?"

"ভাবছো আমার মনে নেই? সুধাময় এবার পাগলের মতো হাসতে লাগলেন। "শুধু তোমার নিজের মুখে ওটা আর একবার শুনতে চাই। যদি না বলো, এই ঘরের দেওয়ালে আমি মাথা ঠুকতে আরম্ভ করবো।"

ভয় পেয়ে শোভনা প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে রইল। তারপর কোনো রকমে বললে, "আমি ভেবে চিন্তে বলিনি। রাগের মাথায় বলেছিলাম, তোমার মনের মৃত্যু হয়েছে। বিশ্বাস করো।"

"আর লক্ষ্মী?" সুধাময় এবার পাগলের মতো ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলেন।

"কই? তার সম্বন্ধে আমি তো কিছু বলিনি। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে বিশ্বাস করো।"

শোভনার মিনতি সুধাময়ের কানেই ঢুকলো না। স্বপ্নাবিষ্টের মতো সুধাময় হঠাৎ বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

কী আর করবে শোভনা? বাড়ি থেকে আপন মনে ওঁর বেরিয়ে যাওয়াটা, শোভনার কাছে নতুন নয়।

নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে শোভনা অনেকক্ষণ কেঁদেছিল। তারপর চোখ বুজে সেই শান্ত স্নিগ্ধ সুন্দর অতীতে ফিরে যাবার চেষ্টা করছিল যেখানে সুধাময়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার। সেই সুধাময়ের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল—যে ওর হাতের কালি মুছবার জন্য নিজের রুমালটা এগিয়ে দিয়েছিল; যে সুধাময় লিখেছিল—'আমরা সবাই আমাদের মনের কালিমা দিয়ে অপরের শুভ্রতাকে নষ্ট করবার চেষ্টা করছি,' যে সুধাময় মানুষের কষ্ট দেখতে পারতো না। মানুষের দুঃখে যার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসতো।

সেই সময় বাইরে মোটরের আওয়াজ পাওয়া গেল। গাড়ি থেকে নেমে এক আমেরিকান ভদ্রলোক ভিতরে এসে ঢুকলেন। "মিঃ ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

শোভনার মনে পড়ে গেল পুলিৎজার-প্রাইজ-প্রাপ্ত আমেরিকান সাংবাদিক ও সাহিত্যিক লোভেন তারযোগে জানিয়েছিলেন যে তিনি কোলকাতায় আসছেন। সুধাময়ের সঙ্গে তিনি সাক্ষাতের

ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সুধাময় সম্মতি জানিয়ে টেলিগ্রামের উত্তর দিয়েছিলেন।

লোভেন আজ হঠাৎ এসে হাজির হয়েছেন। সুধাময় কি ভুলে গেলেন যে আজই ওঁর আসবার কথা ছিল? লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছা করছিল শোভনার। এই বিদেশী অতিথিকে কী বলবেন তিনি?

ভগবান মুখ রক্ষা করলেন। ঠিক সেই সময়েই প্রভাত কর এসে হাজির। সায়েবকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে, ভিতরে এসে প্রভাত কর বললেন, "বৌদি, আপনি চিন্তা করবেন না, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।"

লোভেন বললেন, "আজ সকালে এসে পৌঁছেছি। এখানকার কাগজে ওঁর সুখবরটা দেখলাম। আমার আসবার সময়টা অবশ্য অনেকদিন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।"

প্রভাত কর বললেন, "হঠাৎ একজন আত্মীয়ের অসুস্থতার জন্য ওঁকে বেরিয়ে যেতে হয়েছে। সেইজন্য আমি এসেছি।"

লোভেন ও প্রভাত করের মধ্যে বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠলো। সাহিত্যের ভূগোল বাড়াবার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লেখকরা উঠেপড়ে লেগেছেন। এই বিরাট পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডকেই ওঁরা বাদ দেবেননা। কিন্তু তাই বলে প্রকাশের ব্যগ্রতায় আধুনিক সাহিত্যিক সহজের সীমাকে কিছুতেই ছাড়িয়ে যাবেন না।

চা-পানের পর লোভেন উঠে পড়লেন। যাবার সময় প্রভাত করকেও জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন।

তিন

নিজের হোটেলে বার-এ বসে লোভেন জিজ্ঞাসা করলেন, "এ-সব চলে তো?"

"সামান্য সামান্য।" প্রভাত কর উত্তর দিলেন।

"নোতুন লিখতে আরম্ভ করেছ বুঝি? লোভেন হেসে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর বিয়ারের বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "সাফল্য পেতে গেলে, চুমুক দিলে হবে না, ডুব দিতে হবে।"

রাত্রির কোলকাতাকে দেখতে চান লোভেন। বৈশ্যতন্ত্রী নগরীর অন্ধকারের রূপ দেখতেই এতোদূরে ছুটে এসেছেন তিনি। অদ্ভুত এক বিষয়ের উপর কাজ করছেন তিনি। তাঁর আগামী বই-এর নাম—'তিরিশটি নগরী, তিরিশটি রাত্রি।'

বিয়ারের গেলাসে চুমুক দিয়ে লোভেন বললেন, "বড়ো দুঃখ রয়ে গেল, সুধাময়ের সঙ্গে দেখা হলো না।"

প্রভাত কর বললেন, "দেখা হলে আপনি আনন্দ পেতেন।"

লোভেন আর এক বোতল পানীয়ের অর্ডার দিয়ে বললেন, "ওঁর প্রথম উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ Deathless Mind আমি পড়েছি। প্রাচ্যদেশের সব-ক'টি বৈশিষ্ট্য ওঁর মধ্যে রয়েছে। আর আজকের কাগজে ওঁর নতুন উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার পড়লাম। ভেরী ইণ্টারেস্টিং। কোলকাতার যে সব পল্লী আমি দেখতে চাই, তার সম্বন্ধে অনেক কিছুই তিনি জানেন।"

প্রভাত কর দু'বোতল বীয়ারের পর একটু কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। বললেন, "এই বিশাল নগরীটাই আধুনিক সভ্যতার রক্ষিতা। 'এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষ। তুমি যদি বাংলা-সাহিত্য পড়তে তাহলে সে বিষের কিছুটা খবর পেতে।"

লোভেন পকেট থেকে নোট-বইটা বার করলেন। সেখানে অনেক শহরের নাম লেখা—হংকং, টোকিও, ম্যানিলা, নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, বোম্বাই। আরও অনেক। প্রতিটি নামের পাশে

লাল কালিতে টিক্ দেওয়া। ওইসব শহরের রাত্রি, আর রাত্রির মেয়েদের লোভেন দেখেছেন। আজ রাত্রে কোলকাতাটা শেষ করতে পারলেই দায়িত্ব শেষ।

সুধাময়ের সঙ্গে দেখা হলে ওঁর সঙ্গেই বেরনো যেতো। লোভেন কোলকাতার ম্যাপ খুলে কয়েকটা লাল পেন্সিলে চিহ্নিত জায়গার দিকে নজর দিলেন—কোলকাতার 'রেড-লাইট এরিয়া'। বললেন, "কিপ্‌লিঙ-এর পর তোমরা অনেক এগিয়ে গিয়েছো দেখছি। রেড-লাইট এরিয়া অনেক বিস্তৃত হয়েছে।"

কিপ্‌লিঙ-কে নমস্কার জানিয়ে লোভেন আর এক পাত্র ড্রিঙ্কের অর্ডার দিলেন। বললেন, "What a wonderful man he was!"

প্রভাত কর মুখ বেঁকালেন। "আমরা তাঁকে ঘৃণা করি।"

লোভেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু সুধাময়? তিনি নিশ্চয়ই রুডইয়ার্ড কিপ্‌লিঙ-এর কাছে কৃতজ্ঞ।"

প্রভাত কর বললেন, "জানিনা।"

রাত্রি হয়েছে। প্রভাতের হাতটা চেপে ধরে লোভেন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। "তোমরা যাই বলো, আমি তাঁর কাছে গ্রেটফুল। আমার অনেক কাজ তিনি সোজা করে দিয়েছেন। অনেকদিন আগে রাতের কোলকাতাকে তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন। নগর-পরিক্রমার যে বর্ণনা তিনি রেখে গিয়েছেন তাতেই আমার কাজ চলে যাবে। *City of Dreadful Nights*—what a beautiful name!"

বহুবর্ষ আগে এক উদ্ধত বেপরোয়া শ্বেত লেখকের পদচিহ্ন অনুসরণ করে কোলকাতাকে দেখবেন এ-যুগের দুজন লেখক। চিৎপুর রোড থেকে ওঁরা একটা রিকশায় চড়ে বসলেন। গাড়ি করতে পারতেন লোভেন। ওঁর পরিচয়পত্র দেখিয়ে স্থানীয় মহল থেকে সাহায্যও নিতে পারতেন। কিন্তু রিকশার মধ্যে প্রাচ্যের মাদকতা রয়েছে। এতে তাঁর লেখা আরও রহস্যময় হয়ে উঠবে।

আর একজনের কথা মনে পড়লো। কিপ্‌লিঙ-এর কুড়িবছর পরে তিনিও কোলকাতার নগর-বধূদের দেখতে বেরিয়েছিলেন। তিনিও বই লিখেছিলেন। মিঃ মিনি-কে মনে মনে ধন্যবাদ জানালেন লোভেন।

রিকশাওয়ালা জিজ্ঞাসা করলো, "কোন্ দিকে ?"

প্রভাত কর বললেন, "সোনাগাছি।"

আর সুধাময় ? সেই রাত্রে সেই সময় চিৎপুর রোডের উপর একটা ইলেকট্রিক পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। খেয়ালের বশে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে এইখানে এসে পড়েছেন, নিজেই বুঝতে পারেননি।

সুধাময়ের মনের ভিতরটা যেন জ্বলছে। মনে হচ্ছে, শোভনা যেন ওর পিছন পিছন আসছে। সুধাময়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে লোককে বলছে, "তোমাদের দরদী লেখক। ওঁকে তোমরা চিনে রাখো, নিজের বোনকে নিয়ে গল্প লিখেছেন।"

সুধাময় আজ প্রতিশোধ নেবেন। শোভনাকে বুঝিয়ে দেবেন, সাহিত্যিক সুধাময় ভুল করেন না। এ-কথাও জানিয়ে দেবেন যে, অনেকদিন আগে মেয়েদের হোস্টেলে শোভনা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে যে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, তা না পেলেও সুধাময় বড়ো হতেন।

কিন্তু তার আগে আসল কাজটা সেরে নিতে হবে। হাড়কাটা গলির মধ্যে অনেকক্ষণ ঘুরেছেন সুধাময়। কিন্তু লক্ষ্মীকে দেখতে পেলেন না। তারপর হঠাৎ খেয়াল হলো হাড়কাটা গলিতে তো তাঁর সরস্বতী থাকতো—তাঁর উপন্যাসের সরস্বতী। লক্ষ্মীর ঠিকানাটা তাঁর পকেটে রয়েছে। সেই পোস্টকার্ড-টা দুভাঁজ হয়ে ওঁর বুকের কাছে শুয়ে রয়েছে।

মাথাটা ঘুরছে। দেহটা যেন ফানুশের মত হালকা হয়ে গিয়েছে। এই বিরাট শহরের গহন জনারণ্যকে অবজ্ঞা করে সুধাময় ভেসে চলে যেতে পারেন কোন্ সুদূরে। যেখানে মানুষ উপন্যাসের চরিত্রদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। যেখানে মানুষ মনের গভীরে ঢুকতে চায়না।

যেখানে মানুষ লেখাপড়া জানে না, যেখানে মানুষ কেবল কাজ করে, খিদের সময় খায়, আর রাত্রে নিজের মেয়েমানুষটাকে পাশে নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে—অন্য কিছুই চায় না।

বাড়ির নম্বর—একত্রিশের এম্। কিন্তু রাস্তাটা কোথায়? সুধাময় কোনোদিন সোনাগাছি দেখেননি। লোকে হয়তো শুনলে হাসবে, বিশ্বাস করতে চাইবে না, 'যাবার আগে' উপন্যাসের লেখক কোলকাতার নরককুণ্ড দেখেননি। কিন্তু সত্যি তাই। সুধাময়ের ঘৃণাবোধ হয়েছে। আর মানসপটে ঐ পাড়ার একটা ছবি এমনিই ভেসে উঠেছে। সে বর্ণনা পড়ে পাঠকঁরা চমকে উঠেছে, পাঠিকারা চোখের জল ফেলেছে।

একজন লোককে ডেকে সুধাময় জিজ্ঞাসা করলেন,…"রাস্তাটা কোন্ দিকে?"

হেসে ফেললে লোকটা। তাকে হাসতে দেখে আরেকজন জিজ্ঞাসা করলে, "কী চায় লোকটা?"

"আসল পাড়ার ঠিকানা চাইছে।"

সবাই যেন মিটমিট করে হাসছে। একজন বললে, "পায়ে হেটে কি ফুর্তি হয়? রিকশা করুন। ওরা সব খবর রাখে।"

ওরা সুধাময়কে চেনেনা। সুধাময়ের বই-এর তোয়াক্কা করেনা। তাই এমনভাবে কথা বলতে সাহস করলো।

একটা রিকশায় চড়ে বসলেন সুধাময়। পিছনে একটা ট্রাম একেবারে রিকশাটার ঘাড়ের উপর এসে ব্রেক কষলো। ভালোই হতো যদি ব্রেক না কষে ট্রামখানা রিকশাটাকে গুঁড়ো করে দিতে পারতো। তাহলে শোভনার শাস্তি এবং নিজের চিন্তার হাত থেকে বাঁচতেন সুধাময়।

ইনটেলেক্চুয়াল লেখক হিসাবে সুধাময় গর্ব করতেন। আজ মনে হচ্ছে এ-সবের কোনো মানে হয় না। টলস্টয়কে সাধারণ একজন চাষা একবার বলেছিল—"তোমরা শিক্ষিত মনিষ্যিরা

তোমরা নিজেদের সমস্যা নিজেরা সৃষ্টি করো। যতক্ষণ আমার চাষ করবার মতো একফালি জমি আছে, দুধের জন্য একটা গরু আছে, আর চুমুখাবার জন্য একটা মেয়েমানুষ আছে—পৃথিবীতে আমি কিছুরই তোয়াক্কা করিনা।”

সুধাময় যেন নেশার ঘোরে বুঁদ হয়ে একজায়গায় রিকশা থেকে নেমে পড়লেন। লক্ষ্মীকে তিনি শুধু একবার জিজ্ঞাসা করবেন—“তুই কি বিশ্বাস করিস তোকে নিয়ে আমি গল্প লিখতে পারি? তোকে ভাঙিয়ে আমি দিল্লীর পুরস্কার পেয়েছি?”

লক্ষ্মী, লক্ষ্মী কি এতো রাত্রে নিজের ঘরেতেই আছে? ওদের নিয়ম কি? ওরা রাস্তায় বেরিয়ে আসে? না ঘরের মধ্যে বসে থাকে? সুধাময়ের শরীরটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এতো রাত্রে লক্ষ্মীকে জেগে থাকতে হয়? ও তো ছোটবেলায় সন্ধে হলেই ঘুমিয়ে পড়তো। মা ডেকে তুলে ভাত খাইয়ে দিতেন।···লক্ষ্মীর ছেলেটার দুটো পা পড়ে গিয়েছিল। মরে গিয়ে ভালোই হয়েছে।

অন্ধকার বস্তিগুলোর ছোট ছোট দরজার সামনে কেরোসিন-ল্যাম্প নিয়ে ওরা কারা দাঁড়িয়ে রয়েছে? সুধাময় ওদের মুখগুলো দেখঁতে যেতেই সাত-আটটা বীভৎস দেহ ওঁকে ঘিরে ধরলো। এরা মেয়েমানুষ? ভগবান এদের সৃষ্টি করেছিলেন? সুধাময় শিউরে উঠলেন।

ওদের হাত থেকে কোনোরকমে ছাড়া পেয়ে সুধাময় এগিয়ে গেলেন। ভাবলেন, ‘যাবার আগে’ উপন্যাসে এই রকম একটা দৃশ্য দিতে পারলে বেশ হতো।

সুধাময় আরও অনেক মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, ওরা খিলখিল করে হাসছে। কেউ বলছে—“এসো-না, এমন জিনিস পাবেনা।” কেউ বলছে, “আ যাও আ যাও রাজা! বিজুলী নিকালেগা!”

সুধাময়ের শরীরটা টলছে। লক্ষ্মী কোথায়? লক্ষ্মী তো এদের মতো নয়। লক্ষ্মী তো খুব লাজুক আর শান্ত স্বভাবের মেয়ে ছিল।

হাঁটতে হাঁটতে সুধাময় আর একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। অনেকগুলো মেয়ে সেখানে জটলা পাকাচ্ছে। ওরা বোধ হয় বিড়ি খাচ্ছিল। সুধাময়কে দেখে ওরা সোজা হয়ে দাঁড়ালো। হাফ-প্যাণ্ট-পরা একটা লোক বললে, "আস্থন, ভিতরে আস্থন—"

"লক্ষ্মী।" সুধাময় অস্পষ্ট স্বরে বললেন।

"পাবেন স্যর। খুব লক্ষ্মীমেয়েই পাবেন। যা বলবেন তাই শুনবে।"

"লক্ষ্মীমেয়ে নয়, লক্ষ্মীকে চাই আমি।" সুধাময় ভয়ে ভয়ে বললেন।

"এখানেও সতীপনা!" একটা মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

আর এক বাড়িতে গেলেন সুধাময়! ওরা বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, লক্ষ্মী আছে। একটু দাঁড়ান।"

সুধাময়ের বুকের ভিতরটা কাঁপছে। লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হলে প্রথমে কী বলবেন? 'যাবার আগে' উপন্যাসে অনন্ত সরস্বতীকে যা বলেছিল?

ওই তো একটি মেয়ে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে। প্রচুর মদ খেয়েছে মেয়েটা। লক্ষ্মী কি আজকাল মদ খায়? অন্ধকার থেকে আলোর পথে মেয়েটার মুখটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। নাঃ, এ তো নয়! এ তাঁর বোন লক্ষ্মী নয়। শুধু নামের মিল হয়েছে।

সুধাময়ের হঠাৎ খেয়াল হলো লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। লক্ষ্মীর ঠিকানা তো তাঁর পকেটেই রয়েছে। আর কোথাও সময় নষ্ট না করে ঐ বাড়িটার দিকেই পা বাড়ালেন তিনি।

একটা কবরের সামনে দাঁড়িয়ে লোভেন ছবি তুললেন। ছোট্ট, অনাড়ম্বর কবর। সোনা গাজীর কবর। লোভেন বললেন, "সোনা গাজী, সোনাগাছি হয়েছেন। মিস্টার মিনির বইতেও এই কবরের কথা পড়েছি। এই মুসলমান গাজী সম্বন্ধে সেখানে অনেক কথা লেখা আছে। সেই বর্ণনার সঙ্গে আজকের কবরখানার কোনো পার্থক্যই দেখছিনা।"

প্রভাত কর বললেন, "ও-সব বই আমার পড়া নেই। সুধাময়বাবু থাকলে আলোকপাত করতে পারতেন।"

লোভেন বললেন, "ওরিয়েন্টের মজা-ই এই। কোনো-কিছুরই পরিবর্তন হয় না।"

প্রভাত কর বললেন, "পরিবর্তন হচ্ছে। পরের বার এসে তুমি এইসবের কিছু দেখতে পাবে না। নতুন আইন বলবৎ করা হচ্ছে শীঘ্র।"

লোভেন বললেন, "হাউ সিলি! তোমরা কি ফরেন-এক্সচেঞ্জ চাওনা? তোমরা মদ তুলে দিচ্ছো। প্লেজার গার্লদের দরজায় তালা ঝোলাবে বলছো। তাহলে টুরিস্টদের জন্যে থাকবে কি? শুধু কতকগুলো ভাঙা মন্দির?"

কথাবার্তার মধ্যেই একজন লুঙ্গিপরা মুসলমান এসে হাজির হলো। "একেবারে বাছাই-করা জিনিস্ আছে, স্যর।"

প্রভাত কর বললেন, "ইনি বাইরে থেকে এসেছেন। বই লেখেন। যা টাকা চাও পাবে, কিন্তু ভালো জায়গায় যেতে চাই।"

"আইয়ে আইয়ে সাব্—"

বাড়িটা বেশ বড়ো। লোভেন বাইরে থেকে একটা ছবি নিলেন। লুঙ্গিপরা লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কত মেয়েকে কোলকাতায় রাত্রে জেগে থাকতে হয়?"

"তা হুজুর, নিয়ার্‌লি ওয়ান লাখ।"

"ওয়ানলাক্! তাহলে বোম্বাই, টোকিও, হংকং সবাইকে হারিয়ে দিলো কোলকাতা।"

প্রভাত কর প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন। একটা অশিক্ষিত দালালের কথায় বিশ্বাস করা ঠিক নয়। কিন্তু লোভেন শুনলেন না। ওঁর পাঠকরা এই ধরনের লোকদেরই বিশ্বাস করে।

টাকার অভাব হবে না। এ-বই লিখে লোভেন অনেক টাকা পাবেন। সুতরাং মেয়ে দেখতে চান।

দালাল বললে, "তাহলে শোবার ব্যবস্থা করি, স্যর। পরিষ্কার চাদ্দর, ধোপ ভাঙা বালিশের ওয়াড়—"

"শুতে আসিনি আমরা। কথা বলতে এসেছি। তবে পুরো টাকাই পাওয়া যাবে।"

বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রভাত করের মনে হলো বাড়িটা যেন একটা বিরাট হোস্টেল। বারান্দার বাঁ-ধারে শুধু এক-বিছানা-ওয়ালা ঘরের সারি।

দালালের কানে কানে লোভেন-সাহেব কি যেন বললেন। দালাল আবার মেয়েগুলোর সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করলো। বললে, "হুজুর, ওদের শরমে লাগে।"

লোভেন এবার অনেকগুলো নোট পকেট থেকে বার করলেন। "ছবি থেকে কিছুই বোঝা যাবে না। ছাপাবার আগে চোখগুলো কালো করে দেবো।"

প্রভাত কর তখনও নেশার ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি, তবুও বুঝলেন এমন ভাবে গল্প লিখতে তিনি অভ্যস্ত নন। লোভেন বোধ হয় ভাবে বুঝলেন। বললেন, "লেখায় অব্জেক্টিভিটি চাই। বৈজ্ঞানিক যেমন তার গিনিপিগ্দের সম্বন্ধে নিস্পৃহ, মানুষ সম্বন্ধে আমাদেরও তেমন হতে হবে।"

তারপর বললেন, "রাত্রির জীবন নিয়ে ইংরিজীতে অনেক বই বেরিয়েছে। কিন্তু আমার বইতে একটা আশ্চর্য নতুন জিনিস থাকবে। এবার সেই কাজটা—"

দালালের সঙ্গে কথা হলো। ওর হাতে আরও কয়েকটা নোট গুঁজে দিলেন লোভেন।

পকেট থেকে পোস্টকার্ডটা বার করে নম্বরটা মিলিয়ে নিলেন সুধাময়। শরীরের মধ্যে আগুনের জ্বালা ধরেছে। বেশ বড়ো

বাড়ি। এইখানেই লক্ষ্মী থাকে। অন্ততঃ, একবছর আগে ছিল। লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করবেন—সে তার দাদাকে অতো ছোট ভাবে কিনা। শোভনা যা বলেছে সব মিথ্যা কিনা। তারপর শোভনাকে উনি যা উত্তর দেবার দেবেন···

বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লেন সুধাময়। বুকটা ধক্ করে উঠেছিল। কিন্তু সুধাময় ভাবলেন, লেখককে নিরাসক্ত হতে হবে। সে তো দ্রষ্টা। তার অভিভূত হওয়া চলবে না। সেই জন্যই তো বর্ধমান সাহিত্য-সভায় উনি একবার বলেছিলেন—"লেখকের কেউ নেই। তিনি এক বিশ্ববিহীন বিজনে বসে আপন সাধনায় মগ্ন।"

হঠাৎ যেন কার সঙ্গে ধাক্কা লাগলো। চমকে উঠলেন সুধাময়। চিন্তার ঘোরে খেয়াল করেননি, একটি মেয়ের ঘাড়ের উপর এসে পড়েছেন। মেয়েটি ওঁর মুখের দিকে তাকালো। আহা বেশ স্নিগ্ধ মুখটি তো! মুখটা রং করেছিল, কিন্তু ঘামে কপালের রং গলে গিয়ে আসল রং দেখা যাচ্ছে। সুধাময় তাঁর ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু ওঁর ভদ্র ভাষা বোধ হয় সে বুঝলো না।

এই মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়? সুধাময় ভাবলেন। তারপর ঢোঁক গিলে বললেন, "আমি লক্ষ্মীকে চাই।"

"কে লক্ষ্মী? লক্ষ্মীকে আমি চিনি না।" মেয়েটি বললো।

সুধাময় তখন ওঁর পুরানো স্মৃতি থেকে লক্ষ্মীর বর্ণনা দেবার চেষ্টা করলেন। "বেশ ফরসা রং, গোলগাল গড়ন ছিল।"

মেয়েটি আর শুনলো না। বললে, "লক্ষ্মী নেই তো কি হয়েছে? আমি তো রয়েছি।" মেয়েটি এবার দুই হাতে সুধাময়ের দুটি হাত জড়িয়ে ধরলো।

চমকে উঠলেন সুধাময়। এক ঝট্‌কায় নিজের হাতটাকে মুক্ত করে আরও এগিয়ে গেলেন। যেন একটা ঠাণ্ডা বিষাক্ত সাপ ওঁর হাতটাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

[illegible] দেহের সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে আর একটা ঘুষি মেরে [illegible], "ইডিয়েট, স্কাউণ্ডেল!" মেয়েটিকে তিনি পাশে সরিয়ে [illegible] নিয়ে বললেন, "লক্ষ্মী, তোর ভয় নেই—কিচ্ছু ভয় নেই।"

কিন্তু মেয়েটি তখন আরও ভয় পেয়ে গিয়েছে। সুধাময়কে দেখে চিৎকার করে উঠেছে। প্রভাত কর গণ্ডগোল বুঝে ছুটে বাইরে [illegible]লেন, হয়তো পুলিশের হাতে পড়তে হবে। ছিঃ, সুধাময় যে এখানে আসেন তা তাঁর জানা ছিল না। বোধ হয় ওর কাছেই [illegible] আছে, প্রভাত কর ভাবলেন।

[illegible] আওয়াজ শুনে আরও অনেকে ছুটে এসেছে। [illegible] দেখিয়ে মেয়েটি বললে, "ঐ লোকটা।"

একজন বললে, "কী বাবা! অশান্তি করো কেন? একজন [illegible] একজন ঢুকছো কেন?"

সুধাময়ের ঠোঁট কাঁপছে। কোনোরকমে বললেন, "বাঃ রে, ও-ই তো বললো, লক্ষ্মী নেই তো কী হয়েছে, আমি তো আছি।"

"[illegible] তো তুমি চলে গেলে, আমার কথায় কান দিলেনা।" মেয়েটি বললে। "তারপব দেরিতে ফিরে এলে।"

[illegible] সুধাময়ের থুতনিতে একটা ঘুষি মেরে লোভেনকে বললে, "কিছু মনে করবেন না, স্যর—আপনি আপনার কাজ করুন।"

[illegible] সুধাময়ের কানটা ধরে সে হিড় হিড় করে বাড়ির দরজা [illegible] এল। সুধাময় বাধা দিয়েছিলেন। বিড় বিড় কবে [illegible], "লক্ষ্মী, লক্ষ্মী।"

[illegible] সুধাময়ের গালে একটা থাপ্পড় মেরে রাস্তায় বার করে দিয়ে [illegible] খিল খিল করে হাসতে হাসতে বললে, "ব্যাটা, দেরি করলে এই হয়। ভালো জিনিস হাতছাড়া হয়ে যায়। ভাগ্!"

[illegible] টলতে টলতে সুধাময় রাস্তায় এসে পড়লেন।

"বাবু, রিকশা?" ঠুন ঠুন করে একটা রিকশা সুধাময়ের পাশে এসে দাঁড়াল।